কীর্তিনাশিনী

সমরেশ বসু

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

KIRTINASHINI

A collection of short

by Samaresh Basu

Published by Amar Sahitya Prakash[illegible]

7 Tamer Lane, Calcutta 9

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭১

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী।

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

শ্রীমোহনচাঁদ শীল

প্রিন্ট ও প্রিন্ট

৬ শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট :

গৌতম রায়

ওকে মহিলা বলবো, মেয়ে বলবো, তা বুঝতে পারছি না। একটা বয়সের যে কোন নারীকেই, ভদ্রলোকের মতো উল্লেখ করতে হলে, মহিলা বলাটা প্রচলিত। প্রচলন যাঁরা করেছেন, তাঁদের মতিগতি সহজে বোঝবার নয়। মহিলার ইংরেজি কী? কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলন যাঁরা করেছেন, তাঁরা খুব একটা ভারতীয় মনোভাব নিয়ে করেননি। মহিলা বললেই একটি সমাজের ভাব ফুটে উঠে। কিন্তু মহিলা শব্দের ইংরেজি কি, লেডি? লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টলমেন—ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এই রকম বোঝায়। আর মেয়ে? কন্যা অর্থেও মেয়ে বোঝায়। একটি ভদ্রলোক বা মেয়েটি কি এ উওম্যান না গার্ল?

সচরাচর মহিলা বললে, একটা দূরত্ব সমীহ এবং একটু বেশী বয়সের চিন্তাটাই যেন মনে আসে। মেয়ে বললেই যেন বয়স কমে আসে! মনে হয়, অবিবাহিতাদের মেয়ে বললে তেমন কটু শোনায় না। কিন্তু একটি আঠারো বছর বয়সের বিবাহিত তরুণীকে মহিলা বললে, কেমন যেন শ্রবণে বাজে। আসলে সব ব্যাপারটাই চরিত্র ও পরিবেশের শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণার ওপর নির্ভরশীল। আমার মনে আছে, ঢাকায় এক অভিজাত মুসলমান মহিলা, 'যুবতী' শব্দে আপত্তি করে। পরিবর্তে 'তরুণী' শব্দ ব্যবহার রুচিকর বলেছিলেন। অবিশ্যি তিনি শিক্ষিতাও। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, তিনি 'নারী' বা 'রমণী' কোনটা বেশি রুচিকর জ্ঞান করেন। করিনি, কারণ আমি জানতাম, তিনি 'নারী'কেই ভোট দেবেন। যুবতীর সঙ্গে যৌবন শব্দের যেমন একটা নৈকট্য আছে, তেমনি রমণীর সঙ্গে সম্ভবত রমণের। মহিলাটির মানসিক জগতের কিঞ্চিৎ হদিস এতে মিলে যায়। তারপরে ভাবুন, বাঙালী

হিন্দুদের নাম যদি হয় রমণীমোহন, কী লজ্জা, কী লজ্জা
যুবতীমোহন হলে তো কথাই ছিল না। ঢাকাব সেই মহিলার
শুনে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের কথা মনে হয়ে যায়।

কিন্তু ধান ভানতে শিবেব গীতেব মতো হয়ে যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই, তা-ই বলি। এবং আমার মতো করেই বলি। যাঁর কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম. তাঁকে আমি প্রথমেই মহিলাই বলি, কারণ প্রথম দর্শনেই ও পবিচয়ে তাঁকে আমার তা-ই মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমাব প্রথম পবিচয় একটি ক্লাবে। নাম সুচেতা অধিকারী।

আমাঁরই এক বন্ধু। ক্লাবে নিমন্ত্রণ করেছিল। নিতান্ত তাশ খেলা বা আড্ডার জন্য না, রাত্রেব খাবার ব্যাপারও ছিল। তা ছাড়া আমি তাশ খেলতেও জানি না। আমার বন্ধু সুচেতা অধিকারীর সঙ্গে শুধু পবিচয় করিয়ে দেয়নি, সকলের অলক্ষে সুচেতাকে দেখিয়ে একটি ইঙ্গিতসূচক কথা বলেছিল. যা থেকে আমাকে বুঝে নিতে হয়েছিল। সুচেতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা [illegible] যাকে বলে থাকি নিষ্পাপ তা নয়। বন্ধুটি আমার মোটামুটি ঘনিষ্ঠ, অতএব সে বিবাহিত হলেও, তার জীবনের এবকম একটি গুপ্ত কথা বলতেই পারে। সুচেতা তখন চোখের পাতা নিবিড় করে একটু অপ্রস্তুত লজ্জায় হেসে বলেছিলেন, 'কী বলা হচ্ছে, শুনি ? বাজে কথা একটাও বলো না।'

বন্ধু হেসে বলেছিল, 'যা বলছি, সবটাই কাজের, জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।'

বলা বাহুল্য, সুচেতা আমাকে তা জিজ্ঞেস করতে পারে না, করেনও নি, কারণ, ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় উনি বুদ্ধিমতী। আমার বন্ধু কী বলে থাকতে পারে, সে অভিজ্ঞতা ওর আয়ত্তে আগেই ছিল। উনি শুধু হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।' বলে এমন ভাবে হেসেছিলেন, যেন আমাকে বিশ্বাস করবাব অধিক কিছু জানিয়েছিলেন এবং পরে

আমার সঙ্গে যেরকম ঘনিষ্ঠ ভাবে সুচেতা কথাবার্তা বলেছিলেন, বোঝা গিয়েছিল আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্বের কোন বাধা নেই। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল, সুচেতা অধিকারী অশিক্ষিতা নন। জানা গিয়েছিল, তিনি একটি চাকরিও করেন এবং অবিবাহিতা।

বন্ধুর ভাগ্যটি প্রায় ঈর্ষা করবার মতোই। চাকুরিজীবী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা এবং তারপরেই হাউইয়ের জ্বলে ওঠার মতো, একটি প্রজ্বলিত বর্ণাঢ্য আলোর মালার মতোই পাত্রী চাই-ওয়ালাদের কাছে দারুণ সংবাদ, উজ্জ্বল শ্যামা, স্বাস্থ্যবতী, নাক সামান্য বোঁচা, কিন্তু কালো ডাগর চোখ। বয়স? এখানে একটু গোলমাল আছে, কারণ সত্যি বললে আটাশ বলতে হয়, অন্যথায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে যেটা প্রচলিত, আঠারো বলতেই বা অসুবিধা কী? বয়সের ছাপ? একটা কথা তো জানতেই হবে। বয়সের ছাপ যাদের ফুটে ওঠে, তারা নিতান্ত গ্রাম্য আর নিজের সম্পর্কে অচেতন। আজকাল অনেক চল্লিশ চতুর্দশীর মতো চঞ্চলা বালিকা। হাসিতে খুশিতে ছুটতে দৌড়ুতে প্রগলভতা এমনই, বয়সের ছাপ-টাপ আপনা থেকেই ঝরে যায়।

আমাদের অগ্রজপ্রতিম এক বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী একদিন বলেছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, মেয়েরা অকালেই বুড়িয়ে যেতো, আর আজকাল প্রত্যেকটি মেয়েকেই মনে হয় ফিটফাট সুন্দরী। আমার স্ত্রীকেই তো দেখি, তিনি যেন দিন দিন যুবতী হচ্ছেন। একটা কী রহস্য ওরা আবিষ্কার করেছে!

কথাটা শুনে হেসেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁর কথা অনেকখানি মেনে নিয়েছিলাম। যাই হোক, সুচেতা অধিকারীর রূপ আর স্বাস্থ্যের জন্য এত কথা বলার দরকার নেই। তার সবই ভালো, বক্ষ, কটি এবং নিতম্ব বেশ মানানসই, কিন্তু মেদের ব্যাপারে বিপদ সংকেতের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মেদ একটু বাড়লেই ওঁর এই সুঠাম শরীরের রূপ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মনে হয়, সুচেতা অধিকারী এ বিষয়ে নিশ্চয় সচেতন আছেন, কারণ দেখে

শুনে মনে হয়েছিল তিনি নিজের সব বিষয়েই সচেতন। পোশাক প্রসাধন বিষয়েও। আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যে দিনটিতে তাঁকে ক্লাবে দেখেছিলাম, সেদিন তিনি রঙ মেলানো শাড়ি জামা স্লিপার সাণ্ডেল কপালের ফোঁটা, কানে ফুলের এবং গলায় পাথরের মালা পরেছিলেন, এবং বলাই বাহুল্য, ওঁর স্লিভলেস জামার গলা আর কাঁধের হ্রস্বতা নিটুট বক্ষের আপাতঃ ঔদাসীনতায় আসলে একটি সর্বনাশের সংকেতই জাগিয়ে রেখেছিলেন, তদুপরি নির্লোম নিভাঁজ মেদহীন শ্রোণীদেশ, নাভির নিচের শাড়ি বন্ধনীতে যেন রীতিমতো একটা উস্‌কে দেবার চ্যালেঞ্জ।

সুচেতা অধিকারীর ঠোঁট, অনেকটা পানকৌড়ি পাখীর মতোই স্কচ্ অন্ রকের পাত্রে ডুব দিচ্ছিল। অকল্পনীয় নয় কী? বরফ গলা জলটুকু বাদ দিলে, নীট্ হুইস্কিতে ওরকম নিবিড় চুমক, এক কথায় কলিজায় জোর থাকা দরকার এবং তা ওঁর ছিল। হতে পারে একটু প্রগলভ হয়েছিলেন, দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা তো আছে। গালে আর চোখে রক্তাভাও লেগেছিল ওঁর। যৌবনের আগুন আরো লেলিহান করে তুলেছিল। কারণ সেই বঙ্কিম কটাক্ষ অনেকটা মিছরির ছুরির মতোই। কাটলেও মিষ্টি। কিন্তু ওঁর কথা ছিল স্পষ্ট, শালীন এবং ল্যাস ছাড়া কোনো বিকৃত ভঙ্গি দেখিনি।

মুগ্ধ না হবার কোনো কারণ নেই। ক্লাব, তাশ খেলা, সুরা তার মাঝখানে সুচেতা অধিকারীর মতো, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়, যৌবতী নারীর সান্নিধ্য কার না ভালো লাগে? ঘরসংসারের কথা আলাদা, ক্লাবে এমনটিই তো মানানসই। অবিশ্যি কেউ কেউ ঠোঁট বাঁকাবেন, কিন্তু আসলে আমরা তো অন্তরে চরিত্রে বিশ্বাসে পুরো ফিউডাল। জানি অনেকেই চীৎকার করবেন, করছেনও, কিন্তু আমরা তো আর দেশ-গাঁ ছাড়া ভুঁইফোঁড় না। ভাববাদী থেকে বস্তুবাদী, সকলের কীর্তিকলাপ আচার-আচরণই দেখছি। সারা ভারতে আধ ডজন ইনডিভিজুয়ালের কথা আলাদা, কোটি কোটি মধ্যবিত্তের মধ্যে সেটা এমন কিছু না। সেই আধ ডজনের মধ্যে

কেউ লেনিন মাও সে তুং-এর পদনখকণার যোগ্য কী না তা-ও বিচার্য।

যাই হোক, আবার সেই শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধুর নামটা বলেই ফেলি, সত্যশরণ—আমরা সত্য বলেই ডাকি, তার সঙ্গে প্রথম সুচেতা অধিকারীকে দেখেছিলাম। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত ভালোই কেটেছিল। পরে সত্যর কাছে শুনেছি। সুচেতা অধিকারীকে নিয়ে ও গভীরভাবে চিন্তা করছে। ওর স্ত্রী সুচেতার কথা জানতে পেরেছে, তা নিয়ে সংসারে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই আছে। সে অশান্তি মারাত্মক। জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, চীৎকার চেঁচামিচি, এমন কি হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত। সত্যর স্ত্রী নাকি ওর টাই ধরে একদিন এমন টেনেছিল গলায় রীতিমত ফাঁস লেগে গিয়েছিল। নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়নি। সত্যর বিরুদ্ধে পাড়ায়ও জানাজানি হয়েছে।

শেষ সংবাদ পেয়েছিলাম, সত্য আলাদা ফ্লাট নিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে আর থাকে না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার সম্ভাবনা। সত্য পশ্চাদপদ না। ও স্বীকার করতে রাজী আছে, সুচেতার সঙ্গে ওর এ্যাফেয়ার আছে, অতএব বিচ্ছেদ অনিবার্য।

এই সব সংবাদের মধ্যে, সুচেতার কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমি ওঁর বাইরেটা দেখেছি, যা নিশ্চিতরূপেই পুরুষকে মুগ্ধ করে। ভিতরের সংবাদ জানা নেই, অর্থাৎ ওঁর হৃদয়বৃত্তির সংবাদ যাকে বলে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি। তবে সত্যর মতো পুরুষের এতোখানি অগ্রসর হওয়ার মধ্যে, নিশ্চয়ই সুচেতার হৃদয়াবেগও কাজ করছে।

তবু খারাপ লেগেছিল, কষ্ট পেয়েছিলাম। বন্ধুর সংসার ভেঙে যাওয়া কে আর চায়! বুঝতে পারি আমরা অনেক সময়ই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের শিকার হয়ে পড়ি। তথাপি আমি সুচেতার দোষ দিতে চাই না এই কারণে, যেহেতু তাঁর মহত্ত্ব নেই, কিন্তু ভালোবাসার টান তো আছে। মহৎ মহীয়সী কল্পনাই বা

আছেন, সাধ্বী চরিত্রই বেশি। সব জেনেশুনে একটি বিবাহিত এবং ওঁর থেকে একজন বয়স্ক লোককে নিয়ে এমন ভেসেই বা যাবে কেন? বিশেষ করে যে মেয়ে নিজে উপার্জনশীলা। সত্যর কাছেই জেনেছিলাম, সুচেতা অধিকারী টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব নির্লোভ। এমন কি উপঢৌকনেও বিব্রত আর অস্বস্তি বোধ, আসলে সুচেতা চান, দুটি প্রাণের আবেগ ভরা, নিবিড় একটি সংসার। অতএব কী-ই বা আর বলা যায়!

ছ'মাসের মধ্যেই সত্যর ঘটনাগুলো ঘটে যায়, এবং ছ'মাসের মধ্যে সুচেতা অধিকারীকে আমি আর দেখিনি। অপেক্ষায় ছিলাম সত্য একদিন ওর আর সুচেতার নতুন সংসারে নিমন্ত্রণ করবে। কিন্তু সুচেতাকে হঠাৎ দেখে আমাকে নতুন করে ভাবতে হলো।

এবার দেখা হলো এক হোটেলের ক্যাবারে রুমে। দেখলাম সুচেতার ঠোঁটে সিগারেট ঈষৎ কাঁপছে। গালে এবং চোখে রক্তাভা। পোশাক-প্রসাধনে কোনো ত্রুটি নেই। মদিরেক্ষণা বলতে যা বোঝায়, চোখ দুটি সেই রকম দেখাচ্ছিল, এবং সেই চোখের দৃষ্টি যাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তিনি সত্য না, অন্য একজন, আমার অপরিচিত। আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম, তারা কেউ সুচেতাকে চেনে না। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সত্যর ঘটনা জানার পরে, আর একজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সুচেতাকে বসতে দেখে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ওঁর গায়ে গা ঠেকানো ভদ্রলোকটিকে, আপাতত: যতোই আবেগপ্রবণ দেখাক, বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে। বয়সও চল্লিশের উর্ধ্বেই দেখাচ্ছে, এবং পোশাক-আশাকে ছাড়াও মানুষের চোখে-মুখেই তার বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ পাওয়া যায়। আমার চোখে ভদ্রলোককে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হলো। সুচেতা অধিকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনই নিবিড় আলাপনে, এবং হয়তো আরো কিছুতে মগ্ন,

আমি তো দূরের কথা নাচের দিকেও তাঁদের বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না।

পরের দিন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে; সত্যকে ওর কারখানায় (ওর নিজের একটা ছোটখাটো কারখানা আছে) টেলিফোন করলাম। সত্যর গলার স্বর যেন স্খলিত আর মোটা শোনালো। আমি এমনি খবরাখবর জিজ্ঞেস করলাম, সত্যও সেই রকম জবাব দিল। তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ও ওর নতুন ফ্ল্যাটেই এখনো আছে নাকি! জানালো, তা-ই আছে। ওর গলার স্বরে তিক্ততার ঝাঁজ, পরিষ্কার জানিয়েই দিল, সুচেতার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর বিবাহ-বিচ্ছেদ আপাততঃ স্থগিত আছে, তবে আর কখনোই পুরনো সেই সংসার ফিরে আসবে না। সেটা ভেঙে গিয়েছে।

আমি ওর ওপর দিয়েই জানতে চাইলাম, সুচেতাকে ও ভালো চিনতো, দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াও হয়েছিল, তবে এরকম হলো কেন? জবাবে ওর বিষণ্ণ স্বর শুনতে পেলাম, 'সুচেতাকে আমি চিনতে পারিনি, আজও না। কেন যে ও আমাকে ছেড়ে গেল, আমার কাছে তা স্পষ্টই না।'···

আমি অবিশ্যি খুব আশ্চর্য হলাম না। সুচেতা অধিকারীর মতো স্বৈরিণীর অভাব কলকাতায় নেই, এবং যারা এরকম স্বেচ্ছাচার করে, তারা টাকাপয়সার জন্য নাও করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতাই পর আনন্দ এবং সুখ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সব সময় এসব চরিত্র বুঝে ওঠা কঠিন, তখন ভেসেই যেতে হয়। সত্যর কথা ভাবলে, ভয় আর কষ্ট দুই-ই হয়। ওর সব দিকই গেল। সংসার, স্ত্রী, পুত্র গেল, সুচেতাও ছেড়ে গেল।

অতঃপর গত ছ' বছরে, প্রায় আধ যুগ ধরে সুচেতাকে আমি আরো কয়েকবার দেখেছি। প্রত্যেকবারই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু সবাইকেই প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছে। কখনো

অল্প বয়সের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে দেখিনি, রঙ্গিনীদের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক। ধরে নিয়েছিলাম সুচেতা অধিকারীর স্বৈরিণীবৃত্তির ওটাও একটা বৈশিষ্ট্য বোধ হয়। যতোবারই ওকে আমি দেখেছি, যার সঙ্গেই থাক, খুবই নিবিড়। কখনো ওর সঙ্গে আমার দৃষ্টিবিনিময় বা কথা হয়নি।

এ নিয়ে ভাববার কিছু ছিল না।

তথাপি ভাবতে হলো। যাচ্ছিলাম বম্বেতে। দমদম এয়ার পোর্টে এসে জানা গেল, সন্ধ্যের ফ্লাইট আধ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। আজকাল এটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া ভালো খারাপে কিছু আসে যায় না, ফ্লাইট সব সময়েই বিলম্ব।

লাউঞ্জের এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে, ডাইনিং হলে গেলাম। তেমন ভিড় নেই। একটু চা-পানের ইচ্ছে নিয়ে যে টেবিলে বসলাম, দেখলাম তার দুটো টেবিলের পরেই অন্য টেবিলে সুচেতা অধিকারী বসে। পাশে, আশ্চর্য, আমারই অত্যন্ত চেনা এক বন্ধু, রতীশ হালদার, বেসরকারী ফার্মের বড় চাকুরে। বেশ অবস্থাপন্ন, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি গাড়ি এবং ওর সংসারও বেশ সুখের বলেই জানতাম। ও সুচেতার সঙ্গে এখানে কি করছে?

রতীশকে দেখছি, মুখে কয়েক দিনের গোঁফদাড়ি। চোখের কোল বসা, জামাকাপড়ও তেমন পরিচ্ছন্ন না, চোখ লাল, মুখ বসা। সে করুণ কাতর ভাবে কিছু বলছে। আর সুচেতা শক্ত মুখে মাঝে মাঝে একটু ঘাড় নাড়ছে। সুচেতার যেমন সাজগোজ থাকার কথা তেমনি আছে। রতীশ একবার সুচেতার হাত চেপে ধরলো, সুচেতা হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিল, রীতিমতো বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ।

আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। চা-পানের তৃষ্ণা আর বোধ করলাম না, উঠে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম রতীশটা আবার এই স্বৈরিণীর পাল্লায় পড়লো কী করে? এরা কি কেউ

কোনো খবরই রাখে না? রতীশের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

যথাসময়ে প্লেনে উঠে গিয়ে দেখলাম, সেই প্লেনের যাত্রী সুচেতা অধিকারীও, এবং সে আমার আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ওকে বেশ খুশি ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি প্লেনের ভিতরে গিয়ে মনের মতো জায়গা খুঁজছি, তখনই সুচেতা আমাকে পাশ দিয়ে ডেকে বলে উঠলো, 'আরে আপনি! বম্বে যাচ্ছেন নাকি? আসুন, এখানে বসুন।'

প্রথমটা একটু থমকে গেলাম. তারপরে আত্মধিক্কারেই মনে মনে একটু হাসলাম। দেখা যাক সুচেতা অধিকারীর দৌড়। আমি ওর পাশেই বসলাম। প্রথমে নিতান্তই বার্তা বিনিময়, ভদ্রতা, সামাজিকতা। তারপরে ওর দিক থেকে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার কথা উঠতেই আমি বললাম, 'আপনাকে আমি অনেকবার অনেক জায়গাতেই দেখেছি।'

সুচেতা যেন একটু বিব্রত আর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকবারই আপনার সঙ্গে থাকতো নতুন সংগ্রহ।'

কথাটা বলেও মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম, যদি অন্যভাবে কথাটা নিয়ে আমাকে যাত্রীদের সামনে অপমান করে? ও জিজ্ঞেস করলো, 'সংগ্রহ মানে?'

হেসে বললাম, 'আপনার সংগৃহীত বন্ধুদের কথা বলছি।'

সুচেতা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওহ্! কিন্তু বন্ধু আপনাকে কে বললো? সব তো আমার শিকার।'

স্বৈরিণীর এরকম স্পষ্টবাদিতায় বিস্ময়ের থেকে বিক্ষুব্ধই হলাম বেশি, বললাম, 'সেটা আমি উচ্চারণ করতে চাইনি কিন্তু জানতাম। একটু আগে রতীশকেও দেখলাম।'

'রতীশ! রতীশকে চেনেন নাকি?' ও অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'সত্যর মতো রতীশ আমার বন্ধু।'

তীব্র স্বরে কথাটা বলে বেশ তৃপ্তি বোধ করলাম। কিন্তু সুচেতা সুন্দর করে হেসে বললো, রতীশের বিবাহবিচ্ছেদ পরশু হয়ে গেছে।'

আমি চমকে উঠলেও অত্যন্ত ঘৃণা-প্রোজ্বল দৃষ্টিতে সুচেতার চোখের দিকে তাকালাম। সুচেতাও তাকালো। প্রায় মিনিট খানেক চেয়ে থাকার পরে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। কারণ সুচেতার ঠোঁট বেঁকে উঠছে, নাসারন্ধ্র ফুলছে, একটা উত্তেজনার ঝলক ওর চোখে-মুখে। ও হঠাৎ বললো, 'জানি কি ভাবছেন! ভাবুন, কিছু যায় আসে না। কিন্তু কীর্তিনাশার যা কাজ সে তাই করবে।'

'কীর্তিনাশা!' অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

সুচেতা বললো, 'হ্যাঁ, লেখক মশাই এক্ষেত্রে কীর্তিনাশীও বলতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে আর সংসার ভাঙার খেলা খেলতে আমি খু-উ-উ-ব ভালবাসি। এটাই আমার জীবনের ব্রত।'

আমি বিস্ময়াকুল অসহায় জিজ্ঞাসু চোখে সুচেতার দিকে তাকালাম। সমস্ত ব্যাপারটার সুর আর ধ্বনি যেন অন্য রকম বাজছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? এমন মর্মান্তিক ব্রত কেন আপনার?'

'খুবই সহজ।' সুচেতা একটু হেসে বললো, 'আমি এরকম একটি মর্মান্তিক খেলারই শিকার কিনা। এক সময়ে আমারও সবই ছিল।'

আমি নির্বাক। সুচেতার হাসিতে একটা ছায়া নেমে এলো, একবার কাঁধের ভিতর দিয়ে বাইরের আকাশ দেখলো, তারপর বললো, 'আমার জীবনের মূল যেখানে প্রোথিত ছিল, আমার স্বামী আর সংসার—বড় ভালবাসার। পূজা করে পাওয়া স্বামী

আর সংসার। সেখান থেকে যখন আমাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন আমার চারপাশে সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ঘিরে ছিলেন। কিন্তু কী দেখলাম জানেন? কারোর কিছু এলো গেল না, নির্বিকার সমাজ আর বন্ধুরা চেয়ে দেখলো মাত্র। তাই আমিও দেখাচ্ছি আর দেখছি। সত্যি এ খেলার মধ্যেও দারুণ থ্রিল আছে।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। দেখলাম সুচেতা অধিকারীও নীরবে বাইরের আকাশের দিকে দেখছে। এক সময়ে যখন এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করল প্লেন ল্যাণ্ড করছে, তখন আমি তাড়াতাড়ি সুপ্তোত্থিতের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এতে কি শান্তি পেয়েছেন?'

সুচেতা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না। শান্তি অমূল্য বস্তু, খানিক সুখ পাই।'

বললাম, 'কতোদিনই বা এভাবে চালিয়ে যাবেন? একদিন তো থামতেই হবে।'

'নিশ্চয়, যখন থামবার থামবো।' সুচেতা বললো।

আমি বললাম, 'অনেক তো হলো, এবার থামুন না।'

সুচেতা হেসে বললো, 'দেখুন অনেক কিছু শুরু করা যায় থামানোটা বোধ হয় নিজের হাতে থাকে না। আমি শুরু করেছি, থামতে শিখিনি। কিভাবে থামে দেখি!'

আমি বললাম, 'আমি জানি।'

সুচেতা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানেন? কিভাবে বলুন তো?'

হেসে বললাম, 'বলবো না।'

সুচেতার চোখে নতুনতর বিস্ময়ের ঝিলিক ও আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালো। আমি হেসে বললাম, 'প্লেন ল্যাণ্ড করলো।'

৫

'কিন্তু—?' সুচেতার দৃষ্টি তেমনি। কথা বলতে পারছে না।

আমি বললাম, 'কিছু না, ঠিক আছে। আমি জানি কিন্তু কখনোই বলবো না।'

আমি যাত্রীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পিছনেই সুচেতা অধিকারী।

নায়িকা

মেয়েটির মধ্যে নায়িকা-লক্ষণ, ঠিক কী ছিল, আমি জানি না। সঠিক নায়িকা-লক্ষণই বা কাকে বলে, সে বিষয়েও আমার কোন ধারণা নেই। অবিশ্যি শাস্ত্রীয়মতে যাকে নায়িকা-লক্ষণযুক্তা বলা হয়ে থাকে, তার বিষয়ে একটা কেতাবী ধারণা আছে। না, ভুল হল। নায়িকা-লক্ষণ বলে, বিচার করা হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর রূপ দেখে নানা শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে-রকম শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, আমি ঠিক তার কথা বলছি না। হিন্দুশাস্ত্রমতে নারীর বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে শরীরের বর্ণ, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কেশ ইত্যাদি থেকে নানান্ বিশেষণে নারীদের ভূষিত করা হয়েছে। তার মধ্যে সতী-অসতীর বিচারও আছে।

নায়িকা-লক্ষণ বললে বোধ হয় অন্য কিছু বোঝায়। সতী-অসতীর বিচার এক কথা। নায়িকা-বিচার বোধ হয় আর এক কথা। এসব কোনটাই আমার নিজের কথা, নিজের বিশ্বাসের কথা না। নিতান্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার কথা বলছি। হিন্দুমতে সর্বগুণ সুলক্ষণা, স্নেহশীলা, প্রেমব্যাকুলা কান্তা বা দয়িতা, সুলক্ষণার মধ্যেও সামান্য কয়েকটি রেখা ও রোমরাজির জন্যই যে-নারী গৃহাঙ্গন ও বহিরাঙ্গনের মধ্যপথে বিচরণশীলা, কিংবা স্বর্ণচ্ছটা ও সুদেহিনী নারীর বস্তিদেশ থেকে উদ্গত কেশরেখা নাভিস্থলগামী, একমাত্র এই কারণেই সে সুভোগা গণিকা-লক্ষণা—ইত্যাদির বিচার একরকম। নায়িকা-লক্ষণের কথা

উঠলেই চিন্তা ধাবিত হয় তন্ত্র ও শাক্ত ধারার দিকে। সেখানে তো নটী, ডোম্বিনী, বেশ্যা, যবনী, শূদ্রাণী, ব্রাহ্মণী অনেকেই নায়িকা।

নায়িকা তো, সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্র মতে, প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাও। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী স্তথা। যাঁরা সকলেই একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু সেইজন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া নন, আরো গভীরতর কারণ ও ব্যাখ্যা আছে।

আমি আসলে সিনেমার হিরোইনের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এত কথার পরে এ কথাটা, একটু এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স মনে হতে পারে। না, আমি কোন প্রতিষ্ঠিতা মুভি হিরোইনের কথা বলছি না। আমার স্বল্প-পরিচিতা এক মহিলা, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তাঁর কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য কন্যাটিকে তিনি চিত্রজগতের একটি তারকা করতে চান, সেজন্য আমার সাহায্য চাই। চলতি কথায় আমরা যাকে 'ফিল্মে নামা' বলি তা-ই। এই 'নামা' কথাটাকে অবিশ্যিই 'অবতীর্ণ' অর্থে ধরতে হবে।

আমার কাছে কেন?

কারণ আছে। আমার দু'চারটি গল্প অবলম্বনে ছবি হয়েছে। তা থেকেই অনেকে সেই মহিলার মতই ধরে নেন, চিত্রজগতের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আমার জানা আছে। তার আগে, চিত্রজগতে, আমার অস্তিত্বের স্বরূপ তো তাঁরা জানেনই না, এমন কি যার জন্য ওকালতি করেন, তার রূপ-স্বাস্থ্যের দিকেও বোধ হয় একবারটি ভালো করে তাকিয়ে দেখেন না। অবিশ্যি এ কথাটা বলা হয়তো ঠিক হল না। তারকা, তা মহিলা বা পুরুষ, যে-ই হোক, সকলের কাছে এক রকম অনিন্দ্যনীয় সুন্দর না। অতএব রূপের বিচারে আমার না যাওয়াই ভালো। সত্যিই তো, কোন্ মেয়ে বা ছেলেকে যে কোন্ ভূমিকায় কাজে লেগে যায় তা কে বলতে পারে! আমরা যখন লিখি, আমাদের নারীচরিত্র মাত্রেই রূপবতী এবং স্বাস্থ্যবতী হয় না। পুরুষরাও না কন্দর্পকান্তি। তবু ওই মন্দের ভালো বলে একটা কথা আছে তো। দশজনের পাতে দেবার একটা ব্যাপার

আছে। সেই ভেবেই কথাটা বললাম। কিন্তু তাতে কী যায় আসে! আসলে এ ব্যাপারে, সাহায্যকারী হিসেবে, একেবারেই অক্ষম।

ভদ্রমহিলার অবস্থার কথা যত দূর জানি, ভালো না। আর্থিক অবস্থার কথা বলছি। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের নীচে। স্বামী কোথাও চাকরি করতেন, কী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স কুড়ি-একুশ। সে ছোটখাটো একটি কারখানায় কাজ শিখছে। বেতন সামান্য। তারপরেই এই কন্যা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। আরো দুটি আছে, সে দুটিও কন্যা। ভদ্রমহিলা নিজেও সামান্য বেতনের একটি চাকরি করেন। নিতান্তই সামান্য, এক বালিকা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান বলা যায়।

ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্য জানবার পরে তাঁর কন্যার দিকে ভালো করে তাকিয়ে, কেন যেন মনে হল, এ মুখ আমার চেনা। কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারি না। হয়তো আশেপাশে পথে-ঘাটেই দেখেছি। মেয়েটি দেখতে মোটামুটি সুশ্রীই। স্বাস্থ্য তেমন উজ্জ্বল না, খারাপও না, একহারা, গঠনও দীর্ঘই। এ্যাভারেজ বাঙালী মেয়েদেরই চোখ একটু বড় হয় বলে আমার ধারণা এবং এরও তা-ই। মেয়েটি সলজ্জা হেসে আমার দিকে তাকাল। আবার মুখ নামিয়ে নিল।

আমি হেসে ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'কিন্তু ফিল্মের ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারব না।'

উনি আমার উক্তিকে বিনয় মনে করে বললেন, 'তা-ই আবার কখনো হয় নাকি! আপনার এত গল্প সিনেমা হচ্ছে, সিনেমার কত লোকের সঙ্গে আপনার জানাশোনা, আপনি ইচ্ছা করলেই নামিয়ে দিতে পারেন।'

অবাক হবার কিছু নেই, এরকম কথা অনেকবার শুনেছি। কথা ফেরাবার জন্যই মেয়েটিকে একবার দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও পড়াশোনা করে না?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছে।'

বললাম, 'কলেজে দিচ্ছেন না কেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কলেজে পড়াবার টাকা কোথায় পাই বলুন?'

সহজেই বললাম, 'তা হলে বিয়ে দিয়ে দিন।'

ভদ্রমহিলা যেন আমাকে করুণা করেই হেসে বললেন, 'বিয়ে দেবার মত টাকা যদি থাকত, তা হলে তো কলেজেই পড়াতাম।'

অকাট্য যুক্তি। আমারই ভুল। সত্যিই, বিয়েই যদি দিতে পারবেন তাহলে তো কলেজেই পড়াতেন। সমস্যা তো সে-ই একটাই, টাকা। আর টাকা না হলে বিয়ে? অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মানসিকতাই সকলের জানা আছে। সকলেই জানে মধ্যবিত্তের জীবনের বাস্তবতা, আর তার আদর্শ, সংস্কৃতি অনেকটাই ঘোড়া আর গাধার মিশ্রিত এক সংকরবর্ণের পশুর দ্বারাই চিহ্নিত। মনে আর মুখে, ভিতরে আর বাইরে দুস্তর অমিলের এমন নজিরটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

তা না হয় হল, কিন্তু কন্যাকে 'সিনেমাতেই নামাতে' হবে কেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিজের মেয়ে বলে বলছি না, অভিনয়ে ওর বেশ ন্যাক্ আছে।'

'ন্যাক্' একটি শব্দ, ইচ্ছা করে শিব্রাম চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়ে দিই। ন্যাক্ থেকে পান্ করে, কী শব্দ বের করা যায়, তিনিই ভালো বলতে পারবেন। আজকাল কথাটার প্রচলনও সর্বত্র। ভদ্রমহিলা আরো বললেন, 'কয়েকটা নাটকে অভিনয়ও করেছে, সবাই ভালো বলেছে। তাছাড়া নাচ-গানও ভালো জানে।'

আমি মেয়েটির সলজ্জ হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কোথায়, কার কাছে শিখেছে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমাদের ওদিকেই, একটা নাচ-গানের ইস্কুলে।'

সেখানে কারা নাচ-গান শেখালে, ভদ্রমহিলা তাও বললেন।

শুনে আমার মনে হল, যে রকম শিক্ষালয়ের কথা তিনি বলছেন সেখানে নিশ্চয়ই টাকা দিতে হয়। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে আমার বাধল। উনি নিজেই তার একটা ব্যাখ্যা আমাকে শুনিয়ে দিলেন, 'আসলে মেয়ের যেদিকে ঝোঁক। আমি ওকে সেদিক দিয়েই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাই। লেখাপড়া শিখলেও, আজকাল চাকরির যা বাজার, কোন ভরসা নেই। এদিক দিয়ে যদি উঠতে পারে, সেটাই দেখি।'

এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভালো। কিন্তু ভরসা কি খুব আছে? তা ছাড়া আজ যাঁরা নামকরা চিত্রতারকা, তাঁদের চিত্রাবতরণের ব্যাকগ্রাউণ্ড আমার ঠিক জানা নেই। মাঝে মাঝে নানান্ গল্প-টল্প শুনি। আমি বললাম, 'কিন্তু দেখুন, সত্যি এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। পরিচয় হয়তো কারো কারো সঙ্গে আছে, তাঁদের জগতে নাক গলাবার মত ঘনিষ্ঠতা নেই।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা বললে শুনছি না। আপনার এত গল্প ছবি হচ্ছে, আপনি বললে নিশ্চয়ই নেবে।'

আমি তাঁকে কিছু বলবার আগেই, শর্মিষ্ঠা, (মেয়েটির নাম) বলে উঠল, 'আপনি আমাকে একবার চান্স করে দিয়ে দেখুন, আমি ঠিক পারব।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার মেয়ের এটা একটা ছেলেবেলার স্বপ্ন। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।'

কী বলি! কী বলেই বা বোঝাই! আমার অসহায়তার কথাই আরো স্পষ্ট করে বললাম, 'দেখুন, ও জগৎটা একেবারে আলাদা। ওঁদের যখন যেমন মেয়ে বা ছেলে দরকার, ওঁরা নিজেরাই যোগাড় করে নেন।'

শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, 'তা ঠিক। কিন্তু সব সময় তো তাঁরা দরকারমত খুঁজে পান না। হয়তো আমাকে দেখলে, তাঁদের মনে হতে পারে, আমাকে দিয়ে হবে। আপনি কেবল একবারের মত চান্স করে দিন।'

আরো কিছু যুক্তি-তর্ক বিনিময় করে বুঝলাম, মা-মেয়ের সঙ্গে আমি পারবো না। এর আগেও অনেকের সঙ্গে পারিনি। অথচ সত্যি সত্যি কোন পরিচালক বন্ধু যখন কোন ছেলে বা মেয়ের জন্য ক্রাইসিসে পড়ে, তখন পছন্দমত ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ে না। অগত্যা শর্মিষ্ঠার জন্য আমি আমার একে ঘনিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে দিলাম, 'পত্রবাহিকা ছবিতে অভিনয় করতে চায়। আপনার কোন ছবিতে যদি একে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, একটু বিবেচনা করে দেখবেন।' ইত্যাদি।

অবিশ্যি একটিমাত্র চিঠিতে ভদ্রমহিলা খুশি হননি। এক পরিচালক না নিলে, আবার অন্য পরিচালকের জন্য তিনি আসবেন সে কথা শুনিয়ে গেলেন। যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিণতি কী হয় আমার কিছু কিছু জানা আছে। সে বিষয়ে আমি বিশদ বলতে চাই না। শর্মিষ্ঠা যদি চিত্রতারকা হতে পারে, আমি খুশিই হব। না হতে পারলে সে যেন সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, এটাই প্রার্থনা।

তারপরে শর্মিষ্ঠার কথা আমার আর মনে থাকার কথা না। ছিলও না। কিন্তু যে কারণে আমার মনে হয়েছিল, শর্মিষ্ঠার মুখ যেন আমার চেনা-চেনা, সেই কারণটা জানা গিয়েছিল। যত দিন শর্মিষ্ঠা আমার কাছে আসেনি, ওর কোন পরিচয় আমার কাছে ছিল না, তত দিন ও আমার আশেপাশে আর দশটা মেয়ের মতই ঘোরাফেরা করেছে, বিশেষ ভাবে চোখে পড়ার কারণ ছিল না। আমার সঙ্গে দেখা করার কিছুদিনের মধ্যেই শর্মিষ্ঠাকে আমি নানান্ জায়গায়, নানান্ ধরণের লোকের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি। যাদের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি, ওরা যে সবাই ওর আত্মীয় ব্যক্তি তা আমার মনে হয় নি। না হওয়ার কারণও ছিল। ওর সঙ্গে আমি এমন দু'একজনকে দেখেছি, যাদের আমিও একটু-আধটু চিনি। যেমন একজন মধ্য-বয়স্ক উকীল ভদ্রলোকের সঙ্গে ওকে আমি গাড়িতে দেখেছি। একটু অবাক হয়েছি, মনে প্রশ্ন জেগেছে, আবার আপনা থেকেই তা

মিলিয়ে গিয়েছে। কারণ আর কিছুই না, সেই আইনজীবী ভদ্র-লোকের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা বা যোগাযোগের সূত্রটা কিছুই অনুমান করতে পারি নি। সেজন্যই বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

শর্মিষ্ঠাকে যখন যুবক বয়সের কারোর সঙ্গে দেখেছি, তখন তেমন অবাক হই না। অনেকটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। তবু তার মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে যায়। ও যাদের সঙ্গে যে-সব জায়গায় ঘোরে, গোটা চেহারাটার সঙ্গে ওর পারিবারিক অবস্থাকে মেশানো যায় না। যেমন অভিজাত রেস্তোরাঁয় বা বিভিন্ন ক্লাবে ওকে আমি দেখেছি। যাদের সঙ্গে দেখেছি তাদের সবাইকে চিনি না, কিন্তু তারা যে অবস্থাপন্ন সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেননা শর্মিষ্ঠাদের অবস্থার লোকদের সেখানে যাবার সঙ্গতি নেই। আমি জানি না, শর্মিষ্ঠা আমাকে কখনো দেখেছে কী না। দেখে থাকলেও জানতে দিতে চায় নি। আমিও কখনো আমার উপস্থিতিকে জানাবার বা দেখাবার কোন চেষ্টা করি নি। বরং ওকে দেখে অস্বস্তি বোধ করেছি, পাছে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই লজ্জাতেই মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। অথচ শর্মিষ্ঠাকে মনে হয়েছে, বেশ স্বাভাবিক, সাবলীল। এমন কি খিল খিল হাসিতে ওর সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত হতে দেখেছি।

আমার বাড়িতে যে শর্মিষ্ঠাকে দেখেছিলাম, বাইরের শর্মিষ্ঠা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাস্যে লাস্যে কৌতুকে কটাক্ষে, বেশবাসে, চলনে কথনে এ শর্মিষ্ঠা অন্য এক মেয়ে, যাকে নায়িকাই বলতে ইচ্ছা করে। বালিকা বিদ্যালয়ের হৃতদরিদ্র সেই লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলার মেয়ে বলে মোটেই মনে হয় না।

আমার বাড়িতে শর্মিষ্ঠাকে দেখার পরে বছর দুয়েক কেটে গিয়েছে। স্বস্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে ও বা ওর মা আর কখনো আমার কাছে আসে নি। ইতিমধ্যে শর্মিষ্ঠার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, এবং বলতে হয়, ও দেখতেও আগের থেকে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এই সব ছবি থেকে সাধারণত আমরা একটা সিদ্ধান্তেই

আসতে পারি এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা ব্যাখ্যা করে বলারও দরকার নেই।

আপাততঃ এই চিত্রের মধ্যে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করেই এ পরিচ্ছদের ইতি টানতে চাই। তারপরে পরবর্তী পরিচ্ছেদ।

একদিন দুপুরে আহারের জন্য আমি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোর াঁয় গেলাম। দিনের বেলাতেও আধো-অন্ধকার পরিবেশটি শান্ত, আমার প্রিয় জায়গা। দুপুরে বাইরে খেতে হলে আমি এখানেই আসি। বেয়ারা সকলে আমার পরিচিত। আমি একটি কোণ নিয়ে বসলাম। বেয়ারা খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। এই পরিবেশে সহসা একটু হাসির নিক্বণ, হঠাৎ একটু সুরের ঝংকার বেজে উঠলে খারাপ লাগে না। আমারও লাগছিল না। রক্ষে এই এখানে কোনরকম মিউজিক নেই।

একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, চিনলাম, শর্মিষ্ঠা। ও বেশ সুন্দর করে বলল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

রেস্তোর াঁয় ঢুকে ওকে আমার চোখে পড়ে নি। বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে?'

শর্মিষ্ঠা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছি, তিনি একজন ফিল্ম প্রোডিউসর। উনি অবাঙালী, কিন্তু আপনার খুব ভক্ত, বাংলা প'ড়তে পারেন। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতেই উনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। আসবেন একটু আমাদের টেবিলে?'

অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু আমি শর্মিষ্ঠাকে আমার টেবিলে বসতে বলতে চাই না। আমি উঠেও দাঁড়াই নি। লোকের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারও আমি করতে পারি না বা চাই না। ইচ্ছা না থাকলেও আমি বললাম, 'তুমি যাও আমি যাচ্ছি।'

শর্মিষ্ঠা ওর টেবিলের দিকে গেল, আমি লক্ষ্য করলাম। সেখানে স্যুটেড-বুটেড, চোখে চশমা, মাঝবয়সী একজন বসেছিলেন। আমার চোখ তাঁর দিকে পড়তেই তিনি দূর থেকে

কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমাকেও নমস্কার ফিরিয়ে দিতে হল। আঙুলের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে একটু দেরিতে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিয়ে আমি শর্মিষ্ঠাদের টেবিলে গেলাম। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'দাঁড়াচ্ছেন কেন, বসুন!'

উনিও বাংলাতেই বললেন, 'আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। শর্মিষ্ঠা বলল, 'ইনি সুরেন্দ্রকুমার জৈন, ফিল্ম প্রোডিউসার।'

সুরেন্দ্রকুমার বললেন, 'না না, ওটাই আমার পরিচয় না, আমার অন্য বিজনেস্ আছে। ফিল্ম লাইনে আমি নতুন। দাদা সব ফিল্ম প্রোডিউসারকেই চেনেন।'

'দাদা' মানে আমি। বললাম, 'তা ঠিক বলতে পারি না। কলকাতায় বোধ হয় কয়েক হাজার প্রোডিউসর আছে।'

এমনি দু'চার কথার পরে জানা গেল, সুরেন্দ্রকুমার বর্তমানে একটি ছবি করছেন, যার নায়িকা শর্মিষ্ঠা এবং পরবর্তী ছবির জন্য তিনি আমার একটি গল্প চান। খেতে এসে ব্যবসার কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। আমি ওকে বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে একদিন আসতে বললাম। শর্মিষ্ঠাকে খুবই খুশি আর গর্বিতা মনে হল। ও যেন আমাকে খানিকটা বুঝিয়ে দিতে চাইল, নিজের চেষ্টাতেই ও চিত্রতারকা হতে পারে। এবং ও আমাকে নাম ধরে দাদা বলে বেশ আদরের সঙ্গে বলল, 'একটা খুব ভালো গল্প দিতে হবে, আমাকে যাতে ভালো স্যুট করে।'

এ সব কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর, যদিও শুনতেই হয়। ওদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আমি হাসিমুখেই ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে, আমার টেবিলে ফিরে গেলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদটা কিন্তু একেবারে ভিন্ন। না, আমি কাগজ-

পত্রে কোথাও শর্মিষ্ঠার ছবি বা নাম দেখি নি। সুরেন্দ্রকুমারও কোন দিন আমার কাছে আসেন নি। বেশ কিছুদিন আমি শর্মিষ্ঠাকে দেখতেও পাই নি। সিদ্ধান্তগুলো মিলে যাচ্ছে মনে করে মনে মনে ঠোঁটের কোণে হেসেছি। মেয়েটির প্রতি যে করুণা হয় নি, তাও বলতে পারি না। বেচারী কোথায় ভেসে গিয়েছে কে জানে। কোন্ অন্ধকারে কে জানে।

কিন্তু আমার হাসিটা অনেকটা চপেটাঘাতের মতই আমার মুখে ফিরে এল। বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আমি উত্তর কলকাতায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। বন্ধুর বাড়ির সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। সেখানে একটা সভা চলছিল। পতাকা আর ফেস্টুন ইত্যাদি দেখেই বোঝা যায় রাজনৈতিক সভা এবং আশ্চর্য, মঞ্চে বক্তৃতা করছে শর্মিষ্ঠা।

এক নতুন শর্মিষ্ঠা। ও ডান হাতে মাইক চেপে ধরে, বাঁ হাত তুলে আক্রমণের ভাষায় বক্তৃতা করছে। ওর মুখে দীপ্তি, চোখে ঝলক, ওকে যেন একটি অগ্নিশিখার মত দেখাচ্ছে। বক্তৃতার বাচনভঙ্গি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তীব্র। আমি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দুবার পার্ক করতালিতে মুখর হয়ে উঠল, ধ্বনি উঠল, 'শেম্ শেম্!'

সত্যি, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না শর্মিষ্ঠা এরকম এ্যাজিটেটিং বক্তৃতা দিতে পারে। শ্রোতাদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তারা কী রকম উত্তেজিত। বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, যাক্, শর্মিষ্ঠা এবার নিজের জন্য একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। ওকে আজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ওর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে হয়তো আমার মিল নেই, তবু ভালো লাগে না, আর মনে মনে ভাবলাম, আমাদের পুরনো সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করা উচিত। আমি আজকের যুগ আর যুগের তরুণ-তরুণীদের গতিপ্রকৃতি বোধ হয় বুঝতে পারি না। যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে শর্মিষ্ঠাকে করুণা করে হাসতে যাব কেন।

না, শর্মিষ্ঠাকে আর রেস্তোরাঁয় হোটেলে ক্লাবে নানান্‌ লোকের সঙ্গে কখনো দেখতে পাই নি। শর্মিষ্ঠা অন্য জগতে চলে গিয়েছে।

একদিন দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একটি দুরন্তগতি-গর্জিত মোটর-বাইকের পিছনে বসে যাচ্ছে। ওর চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে। মোটরবাইকের চালক একটি যুবক, যার ট্রাউজারের ওপর গুরু-পাঞ্জাবি, মাথায় বড় বড় চুল, গালপাট্টা জুলফি, চোখে সানগ্লাস। বোধ হয় ওর দলেরই কোন বন্ধু। কিন্তু কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কেননা মেলে না।

শেষ পর্যন্ত সত্যি মিলল না।

কয়েক দিন আগে একটি বিশেষ সভায় আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। যেহেতু সভার আয়োজনটা মূলতঃ রাজনৈতিক এবং কিছুটা সরকারী, সেজন্য আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক দাদা কিছুতেই ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন। সেই মহতী সভায় মন্ত্রীরাও দু'একজন এসেছেন। এবং আমি অবাক হয়ে দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একজন মন্ত্রীকে তাঁর নাম ধরে দাদা বলে তাঁকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলছে। আরো অনেক মানী ব্যক্তির সঙ্গেও ওকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলাম এবং দেখলাম ওরও যথেষ্ট খাতির। তারপরেই লালপাড় শাড়ি পরা শর্মিষ্ঠা মঞ্চের সামনে মাইকের দিকে এগিয়ে এল। এ শর্মিষ্ঠা সেই পার্কের নেত্রী না। এখন সে শান্তগম্ভীর দীপ্তিময়ী।

কিন্তু আমি হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম অন্য কারণে। পার্কের সভায় যে রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসাবে ওর বক্তৃতা শুনেছিলাম, আজকের এই দল তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আগের দলের তুলনায় একেবারে বিপরীত! একেবারে আদা থেকে কাঁচকলায়! শর্মিষ্ঠা এখানে এ দলে এল কেমন করে? বিচিত্র পরিবর্তন।

তবে কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না, কারণ মিলবে না। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে আজ আমার সত্যি নায়িকা বলে মনে

হচ্ছে। শান্ত কিন্তু ওর স্বরে তথাপি নিহিত আছে উত্তেজনা। ও শত্রুপক্ষের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায়। কথাগুলো সকলেরই জানা। পুনরুক্তি সম্ভাবনায় আর উল্লেখ করলাম না।

একটি রূপকথা

আমার রূপকথার গল্পটি শোনাবার আগে, আমি অন্য একটি রূপকথার কাহিনী আপনাদের সংক্ষেপে শোনাতে চাই, কারণ আমার রূপকথাটির সূত্র সেখানেই। অন্য রূপকথাটির বক্তা দিদিমা, শ্রোতা নাতি, এবং গল্পটি এই রকম : এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর ছিলেন এক রাণী। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ধনরত্নে হীরাজহরতে ভরা ভাণ্ডার, প্রচুর শস্য, প্রজারা সুখী, কিন্তু রাজারাণীর মনে সুখ নেই, কারণ তাঁদের কোন পুত্রকন্যা নেই। তাই রাজা বনে গেলেন তপস্যা করতে, এবং তপস্যায় ভগবান তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন, বৎসরান্তের মধ্যেই তাঁর একটি সন্তানলাভ হবে।

হলোও তাই, বছর না ঘুরতেই রাজার একটি সুন্দর ফুটফুটে কন্যা হলো। রাজ্যময় উৎসবের ধুমধাম লেগে গেল। তারপরে কন্যাটি ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলো, রূপের আলোয় যেন ফিনিক ফুটতে লাগলো তার শরীরে, দেখতে দেখতে তার বিয়ের বয়স হয়ে গেল। ঘটকেরা ছুটলো নানা রাজ্যে, কন্যার একটি যোগ্য পাত্রের সন্ধানে। কিন্তু যোগ্য পাত্র আর পাওয়া যায় না। এদিকে কন্যার বয়স হয়ে যাচ্ছে। তাই রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যার মুখ দেখবেন তার সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যাকে প্রথম দেখলেন, সে একটি শিশু বালক, তালপাতা বগলে পাঠশালায় যাচ্ছে। তা

হোক, রাজার প্রতিজ্ঞা বলে কথা, পালন করতেই হবে, অতএব পাঠশালার ছোট্ট বালকের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

তারপরে?

তারপরে কন্যার ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে রাজারাণী বানপ্রস্থে চলে গেলেন। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে খাইয়েদাইয়ে রোজ ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন, আর রাজ্যপাট দেখেন। এমনি করে দিন যায়। কিন্তু একদিন ছোট্ট বালক রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার কে হও?' রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' বালক বললো, 'আমার ইস্কুলের বন্ধুরা রোজ জিজ্ঞেস করে, রাজকন্যা তোর কে হয়? আমি তো কিছু জানি না। বলো, তুমি আমার কে হও!' রাজকন্যা হেসে বললেন, 'আজ নয়, আর একদিন বলবো।'……

দিন যায়, ইস্কুলের ছেলেরা রোজ জিজ্ঞেস করে, ছোট্ট বালক রাজকন্যাকে রোজ জিজ্ঞেস করে, রাজকন্যা হেসে হেসে বলেন, 'আর একদিন বলবো।' তারপরে একদিন বললেন, 'কাল বলবো।' পরের দিন রাজকন্যার হুকুমে-রাজবাড়ী আলোয় আলোয় সাজানো হলো। শোবার ঘরে সুন্দর শয্যা, অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হলো। সন্ধ্যেবেলা ধূপ দীপে ফুলের গন্ধে ভরে উঠলো। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে সাজালেন, নিজের হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ালেন। তারপরে তাকে ফুল দিয়ে সাজানো পালঙ্কের শয্যায় শোয়াতে নিয়ে গেলেন। বালক জিজ্ঞেস করলো, 'বললে না তো, তুমি আমার কে হও?' রাজকন্যা বললেন, 'তুমি শোও, আমি খেয়ে এসে বলবো।' তারপরে রাজকন্যা সোনা, হীরা, পান্নায় কনের বেশে সেজে খেতে গেলেন। খেয়ে নিয়ে এলেন ফুলবাসরে, এবার তিনি বালককে বলবেন, তিনি ওর কে হন। এসে দেখলেন, তাঁর ছোট্ট বর ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি ওর গায়ে হাত দিলেন। ঠাণ্ডা গা। পাশ ফিরিয়ে ডাকতে গেলেন, দেখলেন বালকের বুকের পাশ থেকে কালনাগিনী সাপ এঁকেবেঁকে চলে গেল। বালকের

বর্ণ নীল, সাপের দংশনে মৃত। রাজকন্যার চোখে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল, ধূপের গন্ধ বিষাক্ত বোধ হলো, তাঁর ছোট্ট বরকে বুকের কাছে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি তোমার কে হই। সে কথা যে বলা হোল না।'………

নাতি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?' দিদিমা বললেন, 'আর নেই, গল্পটা এখানেই শেষ।'

এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত রূপকথা। এই রূপকথাটি আমার মুখে শুনে এক অশান্ত-হৃদয় তরুণী জিজ্ঞেস করলো, 'যদি সাপের দংশনে সেই ছোট্ট বরের মৃত্যু না হোত, তাহলে কী হোত?'

এমন জিজ্ঞাসা তরুণীর বঙ্কিম মনেই জাগে। হেসে বললাম, 'তা হলে আর একটি রূপকথা বলতে হয়!' তরুণীর চোখের তারায় কৌতূহলের ঝিলিক। ব্যগ্রব্যাকুল স্বরে বললো, 'আমি সেই রূপকথাটি শুনতে চাই।'

আমি বললাম, 'তাহলে বলতেই হয়। সেই রূপকথাটি এই রকম: পাত্র-পাত্রী অবশ্য সেই রাজকন্যা আর তাঁর বালক বর। ঘটনার শুরু তাঁর ছোট্ট বরকে ফুলশয্যায় শুইয়ে দিয়ে নিজে গেলেন নানা আবরণে আভরণে কনের বেশে সাজতে এবং খেতে। রাজপুরী আলোর মালায় সাজানো বটে, আকাশে ছিল শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। যেন সেই বালক বরেরই মতো। ফাল্গুন মাস। আকাশ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায় ফিনিক দিচ্ছে। উতল বাতাসে নানা ফুলের মদির গন্ধ ছড়াচ্ছে, কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের কানাকানি। কোথায় দূরে বিরহী পাখীটা ডেকে চলেছে, পিউ কঁহা পিউ কঁহা……

রাজকন্যা অপরূপ কনের বেশে ফুলবাসরে এলেন। কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুররেখা। তাঁর মদিরেক্ষণা চোখে ব্যাকুলতা, অথচ কৌতুকের কিরণে ঝিকিমিকি করছে, ঠোঁটের কোণের হাসিতে যেন একটি অপার রহস্যের দোলা। কিন্তু ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন, প্রাণ চমকে উঠলো, দেখলেন শয্যা শূন্য,

তাঁর ছোট্ট বর সেখানে নেই! তিনি ব্যাকুল উদ্বেগে ঘরের চারিদিকে ফুলের নানান সাজ ও ঝালরের দিকে তাকালেন। কোথাও সে নেই। আজ দাস দাসী সখীদের ছুটি দিয়েছেন। সকলেই অন্যত্র আনন্দে মত্ত। কারোকে জিজ্ঞেস করবার মতো কেউ নেই।

ভাবলেন, বালকের দুষ্টুমি নয়তো। ভেবে নিচু হয়ে দেখলেন ফুলশয্যাধারের নিচে, ঘরের কোণে কোণে, কোথাও নেই। তরুণী উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গেল সে?'

আমি বললাম, 'রাজকন্যাও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাই ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে বাজুবন্ধের রিনিঝিনি শব্দ তুলে ঘরের বাইরে অলিন্দে গেলেন। অলিন্দের খিলান দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। নিচে রাজপুরীর বাগানে জ্যোৎস্নায় জুঁই-চামেলির কেয়ারী, নানা ফুল বাতাসে দুলছে। অলিন্দে কেউ নেই। রাজকন্যা সুদীর্ঘ অলিন্দ পেরিয়ে গেলেন পূর্বদিকের খোলা ছাদে। মুখ ফেরাতেই দেখলেন, তাঁর বালক বর। আলসের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। বাতাসে তার উত্তরীয় উড়ছে, গলার মালা দুলছে। দেখে তাঁর যেন ধড়ে প্রাণ এলো।'

'আমারো।' তরুণী একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তারপরে?'

আমি তরুণীর খুশি-উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'তারপরে রাজকন্যা পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে তাঁর বালক বরের কাছে এগিয়ে গেলেন, যাতে বাজুবন্ধে কোনোরকম শব্দ না হয়। যখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখনো বালকের কোনো খেয়াল নেই। সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছে দূরের নারকেল কুঞ্জের দিকে। যেখানে বাতাসে দোলানো পাতা জ্যোৎস্নায় চিক চিক করছে। আনমনে বুঝি সেই বিরহী পাখীটার ডাক শুনছে। রাজকন্যা তার কাঁধে হাত রাখলেন। সে চমকে ফিরে তাকালো, তাকিয়েই যেন কেমন লজ্জা পেয়ে হাসলো। রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, "ঘর ছেড়ে এখানে এসে কি করছো?" '

ছোট্ট বালক বললো, 'কিছু না, এমনি। তুমি যখন খেতে গেলে, ঘরের মধ্যে জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল। বাইরে কি সুন্দর চাঁদের আলো। আমার মনটা কেমন হয়ে গেল, তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।'

সে কথাগুলো এমন ভাবে বললো, যেন বসন্তের এই জ্যোৎস্না রাত্রের কুসুম গন্ধ বাতাস তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে আগে কখনো প্রকৃতি-মুগ্ধ হতে দেখেননি। এখন দেখে তাঁর মনেও যেন চাঁদের জোয়ারে ঢেউ লাগলো। বালক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'এবার বলো, তুমি আমার কে হও?'

রাজকন্যা ঠোঁট টিপে হাসলেন, তাঁর অলংকারের হীরামোতি ঝিলিক দিল, বললেন, 'আমি তোমার রানী!'

বালক অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুমি আমার রানী?'

রাজকন্যা হাঁটু ভেঙে বসে বালকের মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, তুমি যে এ রাজ্যের রাজা, আর আমি তোমার রানী। আমার বাবা এ রাজত্ব তোমাকে দিয়ে গেছেন। তুমি তো এত দিন খুবই ছোট ছিলে, তাই আমিই রাজ্যপাট দেখেছি। এখন তুমি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছো, এখন থেকে তুমিই সব দেখবে। কাজের শেষে যখন এই রানীর কাছে আসবে, তখন আমি তোমার সেবা করবো।'

বলে তিনি তার কোমর বেষ্টন করে ধরলেন।

বালক এমন অভাবিত কথা কখনো শোনেনি। সে খুশি-তন্ময় চোখে রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি রাজা, আর তুমি আমার রানী?" রাজকন্যা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি কি খুশি হয়েছ?'

বালক শিশুর মতো রাজকন্যার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধের কাছে মুখ লুকালো, বললো, 'হ্যাঁ। আমি কালই ইস্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বলবো।' তারপরেই সে খুব চিন্তিত হয়ে মুখ তুলে বললো, 'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না, রাজ্য চালাবো কেমন করে?'

রাজকন্যা বললেন, 'ইস্কুলে তুমি কি কি শিখেছ?'

বালক বললো, 'শুভঙ্করীর নামতা আর অঙ্ক, চতুর্থ ভাগের গল্প আর কাব্য, ব্যাকরণ প্রথম ভাগ।'

রাজকন্যা বললেন, 'সেই যথেষ্ট। বাকী যা রাজ্যপাট চালাতে চালাতেই শিখে নেবে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে ডেকে কালই আমি বলে দেব। তাছাড়া এখন থেকে তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা আর সৈন্যচালনা শিখতে হবে। শত্রু রাজ্য আক্রমণ করলে তখন যুদ্ধ করতে হবে তো!'

বালক বীরদর্পে ঘোষণা করলো, 'আমি তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যাবো।'

রাজকন্যা চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আমাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়?'

বালক বললো, 'আমি এক কোপে তার মুণ্ডু কেটে ফেলবো।'

রাজকন্যা হেসে বালক বরকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'চলো এবার ঘরে যাই। আজ আমাদের ফুলশয্যা।'

আমি চুপ করলাম, দেখলাম তরুণীর চোখ কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় চিক্‌চিক্ করছে। সে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

আমি বললাম, 'তারপর ফুলশয্যার ডিটেল কিছু নেই, রূপকথা রূপকথাই! সে কখনো এ্যাডাল্ট হয় না।'

ইতিমধ্যে বালকের অভিষেক হয়ে গেছে। সে সিংহাসনে বসে রাজ্য চালায়। সে এখন রাজা। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি ও লোকলস্কর সবাইকে নিয়ে সে সারাদিন রাজ্য চালনার কাজ করে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে। সুন্দর কিশোর রাজা পেয়ে সকলেই খুশি।

রাজকন্যাকে এখন আর রাজকন্যা বলা যায় না, তিনি এখন রানী। কিন্তু তিনি সখী-দাসী নিয়ে বিলাসে-ব্যসনে দিন কাটান না। পাকশালা থেকে অন্দরমহলের সব কিছু নিজে দেখাশোনা

করেন। দুপুরে রাজা যখন খেতে আসে তিনি নিজে পরিবেশন করে খাওয়ান, দাসী পাখা ব্যজন করে। তারপরে রাজাকে শয়ন ঘরে বিশ্রামে পাঠিয়ে তার পাতে বসেই খান। বিশ্রামের পরে রাজা যায় নানা ক্রীড়া-কৌশল ও অস্ত্রচালনা শিখতে, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে। ফিরে এসে কখনো একলা, কখনো রানীকে নিয়ে রাজপুরীর কুঞ্জে বিহার করতে যায়। তারপরে ঘরের মধ্যে দুজনের খেলা শুরু হয়। কখনো বাঘবন্দী, কখনো ষোলঘুঁটি বাঘচাল, কখনো কড়ি চেলে গোলক ধাম। যে-ই জিতুক আর যে-ই হারুক, দুজনের সমান আনন্দ। তখন দাসীরা পরিবেশন করে সরবত, মিষ্টি আর পাকা ফল। খেলার শেষে আহার ও শয়ন।

এমনি ভাবে দিন যায়। রাজ্যে কোনো অশান্তি নেই, অভাব নেই, যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা নেই, প্রজারা সুখী। কিশোর রাজা ক্রমে যুবাপুরুষ হয়ে ওঠে। যেমন তার দীর্ঘকান্তি, তেমনি প্রশস্ত বুক, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহের মতো ক্ষীণ কটি।

রানী দেখেন আর তাঁর মনটা যেন চমকে চমকে ওঠে, রাজার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁগো, আমাকে তোমার কি মনে হয়!'

রাজা অবাক হেসে বলে, 'কী আবার মনে হবে, তুমি আমার রানী, আমার সেই রানী!'

রানী জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি সুখী তো?'

রাজা বলে, 'আমার থেকে ত্রিভুবনে আর সুখী কে?'

রাণী গভীর সুখের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে যান।

আমি থামলাম। তরুণীর খুশি-চোখে কেমন একটি ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। বললো, 'তারপর?'

আমি বললাম, তারপর দিন যায়। রানীর মনে হয়, আজকাল রাজার গা যেন ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। বিশেষ করে সাঁঝবেলায়। আজকাল তিনি সাঁঝবেলায় কুঞ্জবিহারে বেশী যেতে

পারেন না। শরীরটা সব দিন ভালো থাকে না। ক্লান্ত বোধ করেন।

একদিন দেখলেন, রাজার হাতে জড়ানো চম্পাকলির মালা। রানী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে এ মালা দিল?'

রাজা বললেন, 'এ মালা আমাকে মালঞ্চের মালীর মেয়ে গেঁথে, পায়ে দিয়ে প্রণাম করেছে।'

বলে রানীর গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন। রানী সেই মালায় যেন কাঁটার খচখচানি অনুভব করলেন। তবুও তাঁর রাজার পরানো মালা, ফেলতে পারেন না। মনে পড়লো, রাজার গায়ে রোজই ফুলের গন্ধ লেগে থাকে। মালী-কন্যা কি রোজই রাজাকে মালা গেঁথে পায়ে দেয়! নানান্ কথা রানীর মনে হতে লাগলো, প্রাণটা কেমন অ-সুখে ভরে উঠলো।

পরের দিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যেবেলাতেই সোনার মতো গোল চাঁদ উঠলো আকাশে। রানী গেলেন মালঞ্চের কুঞ্জে। কুঞ্জের পর কুঞ্জ। এক কুঞ্জ থেকে আর এক কুঞ্জে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, রাজা নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি মেয়ে তাঁর পায়ে মালা রেখে প্রণাম করছে। মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। রানী দেখলেন, পঞ্চদশী মেয়েটার রূপ যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতই ঢল ঢল করছে। মুখে তার কুণ্ঠা জড়ানো লজ্জার হাসি।

রাজা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চেয়ে আছেন। রানীর মনে হলো, তাঁর বুকে শেল হেনে গেল। তিনি চোখ বুজলেন, শুনলেন রাজা জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি আগে ফুলের তোড়া দিতে, আজকাল কেন মালা দাও?'

পঞ্চদশী বললো, 'মহারাজ এর জবাব আমি জানি না, এ আমার অন্তর্যামীর নির্দেশ।'

রাজা জিজ্ঞেস করলো, 'কে সেই অন্তর্যামী?'

পঞ্চদশী বললো, 'আমি তাঁকে চিনি না। সবাই দেবতাকে ফুল দেয়, অন্তর্যামীর নির্দেশে আমি আপনাকে ফুল আর মালা দিই।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছুই দিই না?'

পঞ্চদশী বললো, 'আপনার দেখা পাই, সেই তো আমার পাওনা।'

রাজা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আবেগমথিত স্বরে বললো, 'কাল তোমার মালা আমি রানীর গলায় পরিয়েছিলাম, আজ এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।'

বলে পঞ্চদশীর গলায় মালা পরিয়ে দিল। পঞ্চদশী মুগ্ধ আবেগে বললো, 'মহারাজ, আপনার এই মালা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।' বলে আবার প্রণাম করলো। রাজার অনুমতি নিয়ে, কুঞ্জবীথির ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

রানী পঞ্চদশীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগো, ও তোমার কে হয়?'

এ কথা জিজ্ঞাসা মাত্র, রানীর মনে হোল, একটি শিশু বালকের স্বর যেন দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'তুমি আমার কে হও? তুমি আমার কে হও?'...

রানীর প্রশ্নে রাজা জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল, কথা তার মুখে আটকে গেল। একটু পরে বললো, 'রানী রাত্রে শয়নঘরে গিয়ে তোমাকে বলবো, ও আমার কে হয়।'

রানী বললেন, 'বেশ তা-ই বলো।'

রাজা আজ তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে নানা ক্রীড়া সাঙ্গ করে অন্তঃপুরে এলো। রানীকে না দেখে সন্ধান নিয়ে শুনলো, তিনি শয়নঘরে আছেন। রাজাকে খেয়ে নিতে বলেছেন। এমনটি কখনো হয় না। রাজা একটু আনমনা হলো, খেয়ে নিয়ে শয়নঘরে গেল। দেখলো শয়নঘরে অনেক দীপাবলীর বদলে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। রানী বসে আছেন খাটের শয্যায়, বাজুতে হেলান দিয়ে। প্রদীপের আলোয় তাঁর চোখ দুটি কি চিক্ চিক্ করছে, কিন্তু দৃষ্টি যেন শূন্য। রাজা কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলো, ডাকলো, 'রানী মুখ তোল, আমার দিকে তাকাও।'

রানী মুখ তুললেন না, তাকালেন না। তাঁর শরীর যেন পুতুলের মতো রাজার কোলে ঢলে পড়লো। রাজা ডেকে উঠলেন, 'রানী।'

'রানী কোনো জবাব দিলেন না। রাজা দেখলো রানীর শরীরটা ঠাণ্ডা। বুকের কাছে কান পাতলো, হৃদয় স্পন্দনহীন। রানীর এলানো হাত তুলতে গিয়ে দেখলো, বাঁ হাতের অনামিকার আংটিতে হীরার দ্যুতি নেই, তার বদলে একটি সোনার ক্ষুদ্র পাত্র, গায়ে নীল দাগ, দেখামাত্র রাজা বুঝতে পারলো রানী আংটির পাত্রে রাখা তরল তীব্র বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেছেন। রাজা শিশুর মতো আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'তুমি কি জানতে, আমি বলতে পারবো না, ও আমার কে হয়? রানী এই কি তোমার অভিমান?'......

গল্প শেষ করে তরুণীর দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর দু চোখ জলে ভরা। ভেজা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আগের রূপকথার শেষে, আলো নিভে গেছলো, ধূপের গন্ধ বিষাক্ত বোধ হয়েছিল। এ রূপকথার শেষে পূর্ণিমার রাতের বাতাসে ফুলের গন্ধ কেন?'

আমি বললাম, 'জানি না, গল্পটা এখানেই শেষ, নটে গাছ মুড়িয়ে গেছে।

তথাপি

'ওহে অ শশীভূষণ, এই ভরদুপুরে চললে কোথায়?'

শশীভূষণ ডাক আর জিজ্ঞাসা শুনে দাঁড়ালো, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলো, পঞ্চায়েত বাড়ির রকে বসে আছে কালচাঁদ মুখুজ্জে, গ্রামে যাকে সবাই কালু মুখুজ্জে বলে। শশীভূষণ বলে কালুকাকা। এখন ভরদুপুর না হোক, বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। পঞ্চায়েত বাড়ির সামনেই ঝাড়ালো বটের ছায়া পড়েছে খড়ের চালে।

অনেকখানি জায়গা ছায়ানিবিড়, বাকী রাস্তাঘাট সবই জ্যৈষ্ঠের রোদে এখনই যেন দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায় না, রোদে আগুনের উত্তাপ।

রাস্তার ধারেই খানিকটা জমি ছেড়ে পঞ্চায়েত ঘর। মাটিতে ঘাসের চিহ্ন নেই, কেবল ধূলা। রাস্তার পুবদিকে কিছু বন-শিউলির ঝাড়, তারপরে নিবিড় বাঁশঝাড়। সামনের রাস্তাটা খানিকটা উত্তর দিকে গিয়ে, পুকুরের ধার ঘেঁষে, শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে আবার পুব দিকে গিয়েছে এবং পুকুরের ধারে ধারেই আবার উত্তর দিকে মাঠের পথে হারিয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত-বাড়ির দাওয়ায় বসে, উত্তরে খালের ওপর সাঁকো দেখা যায়। সিমেন্ট ঢালাই করা পাকা সাঁকো। বছর পাঁচেক হলো, সরকার তৈরী করে দিয়েছে।

বনশিউলির ঝাড়ের ভিতর থেকে ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুর ডাক সুখের কি দুঃখের, কেউ বোধ হয় সঠিক কিছু বলতে পারে না। কালাচাঁদ মুখুজ্জের কথার জবাব দেবার আগে, শশীভূষণ একবার বনশিউলীর ঝড়ের দিকে তাকায়। সে একবার ঘুঘুর ডাক শুনে বলেছিল, 'আসলে ঘুঘুই সেই পাখী, যে "খোকা কোথা···কোথা কোথা" বলে ডাকে।'

কথাটা শুনে সবাই হেসেছিল, এমন কি সর্বও। সর্ব—সর্বেশ্বরী, শশীভূষণের স্ত্রী। কোথায় ঘুঘু, আর কোথায় খোকা কোথা ডাকা পাখী। আকাশ আর পাতাল।

শশীভূষণ তা বোঝে, কথাটা একদিক থেকে ভেবে দেখলে বাস্তবিকই মন্দ লাগে। পুত্রহারা মায়ের কান্না যে-পাখীর গলায়, সে-পাখী কখনো ঘুঘু হতে পারে? ঘুঘুর নানান দুর্নাম। ধূর্ত চরিত্রের লোককে ঘুঘু বিশেষণ দেওয়া হয়। কারোকে ভিটা ছাড়া করতে হলেও শাসানো হয়, তার ভিটায় ঘুঘু চড়ানো হবে। এই কেলে—কালাচাঁদ মুখুজ্জে, সামান্য এক কাঁচ্চা বাঁদাড়ের বখ্‌রা নিয়ে শশীভূষণের ভিটেয় অনেকবার ঘুঘু চরাতে চেয়েছে। অবিশ্যি

তার দরকার হয়নি। সম্প্রতি গ্রামের একদল ছোকরা মিলে সেই বাঁদাড় সাফসুরত করে দিব্যি একখানি ঘর তুলেছে। ব্যাপার কী? না, গাঁয়ের ভিতর পার্টির একটা অফিস হবে। কথাটা ছোকরাদের জিজ্ঞেস করেছিল কালাচাঁদ মুখুজ্জে নিজেই।

জায়গাটা শশীভূষণের নাচদুয়ারের—খিড়কি দরজা যাকে বলে, পিছনে, ছোট একটা শরিকী পুকুরের ধারে। বাঁদাড়ের পাশ দিয়েই, কয়েক ঘর মেয়ের যাতায়াতের, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জায়গা ছিল। কিন্তু কয়েক ঘরের মধ্যে কিছু ঘর কিছু বছরের মধ্যে পাইখানা তৈরী করে নিয়েছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা আর বাঁদাড় পুকুরে বাঁশঝাড়ে যাতায়াত করে না। ছোকরাদের হঠাৎ কোদাল কুড়াল কাটারি শাবল নিয়ে বাঁদাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে শশীভূষণ নাচদুয়ারের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তার মনে হয়েছিল, কালাচাঁদ মুখুজ্জের নাচদুয়ারের ভারী দরজাটাও খুললো বলে। তার মতো লোক এ রকম একটা ঘটনা কখনো নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না।

শশীভূষণের একটু ভুল হয়েছিল। কারণ সে ভুলে গিয়েছিল কালাচাঁদের দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে বাঁদাড় দেখা যায়। বলতে গেলে, সাতসকালের ঘটনা। সকাল তখন আটটা হবে। কালাচাঁদ বাড়িতেই ছিল, খবর পেয়ে প্রথমে সে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, ভ্রূকুটিরক্ত চক্ষে ঘটনা দেখে সেখান থেকেই হাঁক দিয়েছিল, 'ব্যাপার কী? ওখানে কী হচ্ছে কী এ সব?'

ছোকরাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছিল। বাকীরা যেমন কুড়াল চালাচ্ছিল, তেমনি চালিয়ে যাচ্ছিল।

শশীভূষণ তখনই বুঝেছিল, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার না। ছোকরারা সকলেই গাঁয়ের এবং চেনাশোনা। কেউ কেউ তার সমবয়সীও। সকলেই পার্টি করে, বলতে গেলে ওরাই এখন গ্রামের

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যারা কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল, আর নিজেদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা বলেছিল, তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে ডেকেছিল, 'এই যে কালুকাকা, একবার এখানটিতে আসুন, ব্যাপারটা বলবো।'

কালাচাঁদ মধ্যবয়স্ক লোক, কিংবা তারো বেশী, যাট ছোঁব-ছোঁব, কিন্তু শক্তপোক্ত হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পুকুরের ওপারের দোতলা বারান্দা থেকে সে শশীভূষণের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। পুকুরের জলে পানা না থাকলে কালাচাঁদের বাড়ির প্রতিবিম্ব পুকুরে দেখা যেতো এবং শশীভূষণ ভেবেছিল, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে, ঘটনার মধ্যে শশীভূষণের হাত আছে।

কালাচাঁদ তার পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির মোটা কাঁঠাল কাঠের নাচ দুয়ারের দরজা খুলে, রীতিমতো রোখ্‌পাক করে বেরিয়ে এসেছিল। পরনের ধুতিরই এক অংশ তার চওড়া মোটা বুকে ঢাকা দেওয়া ছিল, যার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার তেলে-জলে-মাখা পৈতা। কিন্তু কুড়াল-কোদাল যারা চালাচ্ছিল, তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তারা যেন ময়দানবের সম্মোহিত সহচর। ঝপঝপ হাতের যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। গোটা কয় যজ্ঞিডুমুর, বাবলা গাছ ছাড়াও মাঝখান বরাবর যে আমগাছটা ছিল, সেটার গায়েও কোপ পড়ছিল। একটু দূরেই ছাগলবটি লতায় জড়ানো তালগাছটাও বাদ যাচ্ছিল না। অন্যান্য ছোটখাটো গাছপালা ঝোপজঙ্গলের তো কোনো কথাই ছিল না। কর্মীদের কাজে বাঁদাড় যেন দক্ষযজ্ঞের মতো হয়ে উঠেছিল, ধুলা উড়তে আরম্ভ করেছিল এবং ইতিমধ্যে পুকুরের পাড় ঘিরে পাড়ার ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ অনেকে ব্যাপার দেখবার জন্য ভিড় করেছিল।

ছোকরাদের একজন কালাচাঁদকে আপ্যায়ন করে এগিয়ে গিয়ে ডেকেছিল, 'আসুন কালুকাকা। আমরা এখানে একটা ঘর বানাবো।'

কালাচাঁদ ব্যাপারটার আকাশ পাতাল কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অবাক স্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'ঘর ?'

'হ্যাঁ, ঘর।' ছোকরা বলেছিল, 'মাটির দেয়াল-টেয়াল তুলবো না। ছ্যাঁচা বেড়ার ঘর করবো। বাঁশের দাম খুব বেশী, তা হোক। স্‌সালা বর্ষাকালে কখন বান-ফান আসবে, মাটির দেয়াল গড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, তার চেয়ে ছ্যাঁচা বেড়াই ভালো। খুঁটি পুঁতে, বাঁশের ফ্রেম করে তার ওপরে খড়ের চাল করবো। আমাদের তো আর মাগ্‌-ভাতারের ঘর করা না, বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলে চোখে রস কাটবে!'

বক্তার কথা শুনে, আরো কয়েকটি ছোকরা হেসে উঠেছিল, কিন্তু কর্মীদের যেমন কাজ তেমনি চলছিল। কালাচাঁদ মুখুজ্জে, তার জন্মকালের মধ্যে এমন দিশাহারা অবাক বোধ হয় আর কখনো হয় নি, বরং সে লোককে নানান্ ভাবে অবাক করেছে। প্রথমবার সে উচ্চারণ করেছিল, 'ঘর ?' দ্বিতীয়বার কোনো রকমে উচ্চারণ করেছিল, 'মানে ?'

'বুঝলেন না ?' ছোকরা হেসেছিল। বলেছিল, 'আপনাদের এ পাড়ায় পার্টির একটা ঘর না করলে আর চলছিল না। যখন তখন তো আর এর তার বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসতে পারি না। অথচ পাড়ার ভেতর না থাকলে কাজকর্ম হয় না। বুঝলেন না, কে কখন চাল পাচার করছে, ধান পাচার করছে, কে কার পেছনে বাঁশ দিচ্ছে এসব দেখাশোনা করা আর কী!'

সকালের বাতাসে শশীভূষণ স্পষ্ট টের পেয়েছিল তাড়ির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কর্মীরা সেইজন্যই ময়দানবের অনুচরদের মতো, দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঁদাড় সাফ করছিল। শশীভূষণের দৃষ্টি ছিল কালাচাঁদের দিকে।

ঘটনা শুনে, এবং তার পরিণতি ভেবে, কালাচাঁদের হতভম্ব ভাব কেটে আসছিল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, চোখ

জোড়ায় রক্ত ছুটে এসেছিল এবং সে আবার শশীভূষণের দিকে তীব্র সন্দেহে তাকিয়েছিল।

সেই তাকানোই কাল করেছিল, শশীভূষণ নিজেও জানতো না কালাচাঁদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই সে হেসে ফেলবে। কেন যে তার হাসি পেয়েছিল, সে নিজেও জানে না। সেই দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রই কালাচাঁদ ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ ফাটিয়েছিল, 'মাম্‌দোবাজি! আমার সঙ্গে? মগের মুলুক পেয়েছ সব, না? কথাবার্তা নেই, পরের জমিতে এসে ঘর তুললেই হলো! খবরদার বলে দিচ্ছি, ভালো হবে না। এসব কার চক্রান্ত, আমি সব জানি।'

কালাচাঁদ তার রক্তচক্ষে আর একবার বন্যবরাহের মতো শশীভূষণের দিকে তাকিয়েছিল।

শশীভূষণের আবার হাসি পেয়েছিল। কিন্তু যারা বাঁদাড় দখল করে সাফসুরত করছিল, তারা শশীভূষণের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেনি। সেই মুহূর্তেই একটা বড় যজ্ঞিডুমুরের গাছ মাটিতে পড়েছিল এবং আমগাছের গোড়া মড়মড় করে উঠেছিল।

কালাচাঁদের সামনে, গুটিকয় ছোকরা হো হো করে হেসে উঠেছিল, একজন বলেছিল, 'এই দ্যাখো, কালুকাকা, আপনি চটছেন কেন? মামদোবাজির রাজত্ব চালাতে দেবো না বলেই তো আমরা এখানে ঘর করছি। আপনার ঝাড় থেকে আমরা পঁচিশটা বাঁশ নেবো। কিছু খড়ও আপনাকে দিতে হবে চালের জন্য! আর দেখছেন তো আমরা নিজেরাই জনমজুর খেটে বাঁদাড় সাফ করছি, তার পরে ঘরামীর কাজও আমরা করবো। এখন পাঁচটা টাকা দিন তো, একটু দম দেবার ব্যবস্থা করি।'

'মানে?' কালচাঁদ ছোট শব্দ উচ্চারণ করেছিল। তার লাল চোখে তখন কেমন একটা ভীতি-সংশয়। দেখেছিল, কয়েকটি ছোকরা তাকে ঘিরে রয়েছে।

ছোকরা বলেছিল, 'দেখবেন, আবার বাবাকে গিয়ে লাগাবেন না

যেন। আপনার তো কোনো গুণে ঘাট নেই। দম মানে, ফকুরের ওখান থেকে দু ভাঁড় তাড়ি আনতে দেবো। আমাদের গরুর ডাক্তার বলেছে শোনেননি, তাড়ি খেলে শরীর ভালো থাকে, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।'

কয়েকজন হেসে উঠেছিল এবং একজন কালাচাঁদের কোমরের চাবিতে হাত দিয়ে বলেছিল, 'টাকা সঙ্গে আছে, না বাড়ি থেকে আনতে যেতে হবে?'

ব্যাপার দেখে শশীভূষণ শব্দ করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই একটা ছোট ঢিল তার পিঠে এসে পড়েছিল।

শশীভূষণ ভ্রূকুটি-অবাক চোখে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল নাচদুয়ারের ভিতরের গলিতেও দেখা গিয়েছিল দুটি চোখের ভ্রূকুটি-দৃষ্টি, কিন্তু সে চোখ দুটি ছিল দুর্গাপ্রতিমার মতো আয়ত এবং ভ্রূকুটি-দৃষ্টি ছিল রোষকষায়িত। চোখ দুটি যার, সে শশীভূষণের সর্বেশ্বরী। শুধু নামে না, সব দিক থেকেই সে শশীভূষণের সর্বেশ্বরী, তার

শশীভূষণ তাকাতেই সর্বেশ্বরী অঙ্গুলিসংকেতে তাকে কাছে ডেকে-ছিল। শশীভূষণ কাছে গিয়েছিল। সর্বেশ্বরী ফোঁস করে উঠেছিল 'তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? জানো না যেমন শয়তান কেনে মুখুজ্জে, তেমনি গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো! সাপে-নেউলে লড়াই হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি দাঁত বের করে হাসলে যতো কোপ এসে তোমার ওপর পড়বে। যাও, শীগ্‌গির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

শশীভূষণ তৎক্ষণাৎ নাচদুয়ারের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মনে হতে পারে শশীভূষণ স্ত্রৈণ, সুন্দরী স্ত্রীর হুকুমে চলে। আসলে তা না। দিনকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংসার করতে যে স কুটকচালি নিয়ে চলতে হয়, শশীভূষণের সে সব সাংসারিক জটি বুদ্ধি একটু কম। সর্বেশ্বরী অর্থাৎ শশীভূষণ যাকে সর্ব বলে ডাকে তার সাংসারিক বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রয়োজনটা অতএব শশীকে নিতেই হয়।

সর্বেশ্বরী মিথ্যা কিছু বলে নি। কালু মুখুজ্জে বা গাঁয়ের পার্টিওয়ালা ছেলেরা, শশীর হাসির অপরাধেই যে কোনরকম নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে পারতো। নিষ্ঠুর সর্বনাশ করতে এরা কেউ কারোর থেকে কম না, যদিও নিজেদের মধ্যে এদের লড়াই লেগেই থাকে।

বাঁদাড়ের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত কালু মুখুজ্জেকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল। টাকা দিতে হয়েছিল, বাঁশ খড় সবই দিতে হয়েছিল, কিন্তু আবার বিস্ময়কর রকমে ছেলেগুলোর সঙ্গে কালু মুখুজ্জের আঁতাতও হয়েছিল।

শশী কোনোদিন বাঁদাড়ের অংশ নিয়ে তার দাবি জানায় নি। জানালে তাকে ভিটেমাটি ছাড়তে হতো, এটাও তাকে তার সর্ব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সর্বেশ্বরী রূপসী কিন্তু বিয়ের আগে ছিল গরীবের মেয়ে, বিয়ের পরে গরীবের বউ। কথায় বলে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। সর্বেশ্বরী সুন্দরী ও ঘরণী দুই-ই। সে ঘর পায় নি, বর পেয়েছে।

শশী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রীর মর্যাদা বলতে যা বোঝায়, সে-বোধও তার পুরোমাত্রায় আছে। কিন্তু তার অন্তরে যতোটা সাধ, সাধ্য ততো নেই। সংসারে অনেক স্থূল সুখের উপকরণ আছে, যা পাবার জন্য মানুষের হাহাকারের অন্ত নেই। শশী সেই সব কোনো উপকরণ দিয়েই সর্বকে সুখী করতে পারে নি।

এ দুঃখটা তার ভিতরে মোচড় দেয়, মুখ ফুটে বলতে পারে না, কারণ সর্ব বিরক্ত হয়, রাগ করে বলে, 'যে সুখ আমার কপালে নেই, তার জন্যে কেন মন গুমরে মরো! তুমি আর তোমার যা আছে তাই নিয়েই আমার শান্তি।'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে, মনটা মানতে চায় না। পিতৃ-পুরুষের ভিটা আর গত দুই বংশের অভাবের চাপে মাত্র দশ বিঘা জমি সম্বল। দশ বিঘা সম্বলটা এমনি কম না, কিন্তু বিধবা দিদি

এবং তাঁর তিনটি সন্তানসহ সংসারে দশ বিঘার ফসল কিছুই না। সে জমিও ভাগে দেওয়া, মধ্যস্বত্ব ছাড়া উপায় নেই, কারণ তাল-পুকুরে ঘটি না ডুবুক, একদা নামকরা প্রাচীন বাঁড়ুজ্জে বংশের অধস্তন সন্তান শশীভূষণ আর যাই করুক, নিজের হাতে চাষআবাদ করতে পারে না, কখনো শেখেও নি। শিখেছে একটা কাজ, যা শুরু করে গিয়েছিলেন তার নিরুপায় বাবা, পৌরোহিত্য। পৌরোহিত্য পেশার মধ্যেও প্রতিযোগিতা কম নেই, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মতো কাজ কমই জোটে, তথাপি পূজা-পার্বণ মিলিয়ে অভাবের মোকাবিলা কিছুটা করা যায়।

কিন্তু সমান সংসারের দিকে তাকিয়ে শশীর কেবল মনে হয়, জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল মিলছে না। সকলেই অগ্রগামী, সে-ই পিছনে পড়ে থাকছে। এ সব ভেবে তার মন যে কেবল বিমর্ষ হয় তা না, একটা অশুভ ভাবনা যেন তার মস্তিষ্কের সীমান্তে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কারণও এই কালু মুখুজ্জে এবং তার মতো ব্যক্তিরা। তাদের কথার মধ্যে প্রায়শই এমন একটি ইঙ্গিত থাকে, সর্বেশ্বরীর মতো স্ত্রী নিয়ে নিরুপদ্রবে ঘর করাটা একটা অবাস্তব রীতিনীতিহীন ব্যাপার। বিশেষতঃ শশী-ভূষণের মতো লোকের পক্ষে।

শশীভূষণ অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ, কিন্তু সে চরিত্রের দিক থেকে নিরীহ বিরোধিতা এড়িয়ে চলতে চায়। তার যতো কথা সর্বেশ্বরীর সঙ্গে, এবং সর্বেশ্বরী সে-সব কথা শুনলে খিলখিল করে হাসে।

সে হাসি যেন শশীর বুকে ঝড়ের মতো বাজে, সর্বেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত রক্তাভ মুখ ও শরীরের অধরা তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সর্বেশ্বরী বলে, 'যারা ওসব বলে, তারা যেন আমাকে বলে যায়, কোন্ রীতিতে চললে ভালো হয়। না হয় একবার যাচিয়ে দেখবো।' তার পরে শশীর দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বলে, 'ওদের কাছে তোমারই বা এতো ভালোমানুষ হয়ে

থাকবার দরকার কী ? তুমিও সকলের সঙ্গে, দিনকালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখো। মুখ ভার করে থেকে লাভ কী ? আমি তো ঠিক করেছি সবাই যেমন, আমিও তেমনি করে তাদের সঙ্গে চলবো, দেখি আমার কী করতে পারে !'

সর্বেশ্বরীর কথায় শশীভূষণ খানিকটা আস্থা পায়। সে জানে, সর্বেশ্বরীকে নিয়ে যে যাই বলুক, তার মুখকে সকলেই কিছু-কিঞ্চিৎ ভয় পায়। সে কারোকেই ছেড়ে কথা বলে না। সর্বেশ্বরীর প্রতি সকলের আকর্ষণ যতো, সমীহও যেন ততো, যা শশীর প্রতি নেই।

*　　*　　*　　*

কালু মুখুজ্জের ডাক শুনে শশীভূষণ দাঁড়ালো। পঞ্চায়েত-বাড়ির বেড়ার গায়ে কৃষিঋণ, সার ইত্যাদির ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন ছাড়াও হিন্দী সিনেমার ছবির বিজ্ঞাপনও আছে। শশীভূষণ বললো, 'ভর-দুপুর আর কোথায় ? যাচ্ছি একটু ছেষট্টি দাগের মাঠে, দেখি গিয়ে জমিতে সার দিল কী না !'

কালু মুখুজ্জে একটি ইতর বাক্যের সঙ্গে বললো, 'মিছেই এ রোদ মাথায় করে যাচ্ছো, হারামজাদাদের চেনো না ! যদি বলে থাকে আজ সার দেবে জমিতে, তবে এক হপ্তা ধরে রাখো। সার কি আগেই কিনে দিয়েছ, না তোমার ভাগের চাষী কিনেছে ?'

শশীভূষণ বললো, 'নিজেই কিনে দিয়েছি।'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'তবেই হয়েছে। তোমার সার সে আগে নিজের জমিতে দেবে, তার পরে পয়সার যোগাড় হলে সার কিনে তোমার জমিতে দেবে। এত দেখেশুনেও এমন বোকার মতো কাজ করো কেন ?'

কালু মুখুজ্জের কথাগুলো একেবারে মিথ্যে না, কিন্তু শশীভূষণ সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারে না। অথচ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করতে গেলে কালু মুখুজ্জের কথায় বাস্তবতাই বেশী।

সে আবার বললো, 'কেন মিছিমিছি এই রোদ মাথায় করে এখন যাবে? খেয়েদেয়ে বেলা পড়লে যেও, তখন যাচাই করলেই হবে। এসো, দাওয়ায় এসে একটু বসো।'

শশীভূষণের সে ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও নেই, যদিও এই রোদে মাঠে না যাওয়ার পরামর্শটা তার মনে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু কালু মুখুজ্জে কী প্রসঙ্গ পেড়ে বসবে, সেটাই চিন্তার বিষয়। সে বললো, 'বেরিয়েছি যখন একবার দেখেই আসি।'

কালু মুখুজ্জে বললো 'মিছিমিছি যাচ্ছো। তা তুমিও কি আজ ইস্টিশনের দিকে যাচ্ছো নাকি?'

শশীভূষণ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলুন তো?'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'আজ তো সব পাড়া ঝেঁটিয়ে মেয়ে-মিনসে হিন্দী বায়স্কোপ্ দেখতে যাচ্ছো। বউমা যাচ্ছে না?'

বউমা অর্থাৎ সর্বেশ্বরী। গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে, স্টেশনের কাছে সিনেমা হল। গ্রাম থেকে প্রায়ই সব গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সেখানে সিনেমা দেখতে যায়। গ্রামের সবাই আজকাল হিন্দী বায়স্কোপ দেখে, বায়স্কোপওয়ালারাও হিন্দী বই বেশী আনে।

সর্বেশ্বরী দু-চারবার যে যায় নি তা না। আজ সর্বেশ্বরীর যাবার কথা নেই, তাই বললো, 'না, আপনার বউমা আজ যাবে না।'

কালু মুখুজ্জে বাঁধানো দাঁতে হেসে বললো, 'শুনলাম এ বায়স্কোপটাতে নাকি মাগীদের অনেক ল্যাংটা কারবার আছে। চলো না, খুড়ো-ভাইপো দেখে আসি।'

শশীভূষণ একটু হেসে বললো, 'আপনি যান, আমি যাবো না।'

কালু মুখুজ্জে হেসে বললো, 'তুমিও যেতে, যদি বউমাটি যেতো। বউকে পাহারা দিতে হবে তো!'

কথাটা একেবারেই মিথ্যা। শশী কখনো বউ পাহারা দেবার জন্য বায়স্কোপ দেখতে যায় নি।

সে জবাব না দিয়ে যেতে উদ্যত হলো। কালু মুখুজ্জে বলে

উঠলো, 'শশী শুনেছো তো, আমাদের গোবরা বাউরি একটা নতুন টানজিটার কিনেছে?'

টানজিটার মানে ট্রানজিস্টার রেডিও। কথাটার মধ্যে একটি বিশেষ ইঙ্গিত এবং খোঁচা—দুই-ই ছিল।

সর্বেশ্বরীর একটি ট্রানজিস্টারের সাধ আছে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলে না। তবে মাঝে-মধ্যে সর্বেশ্বরী কালু মুখুজ্জের বাড়িতে ট্রানজিস্টারে নাটক গান শুনতে যায়। শশীভূষণ বাধা দেয় নি, কিন্তু মুখ থম্‌থমিয়ে উঠেছে।

সর্বেশ্বরী তা বুঝতে পারে এবং হাসি দিয়ে হাল্‌কা করে বলে, 'এর জন্য তুমি মুখ ভার করো কেন? আমি মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে-বউদের সঙ্গে বসে গান শুনি, তাতে দোষ কী?'

সর্বেশ্বরী এমন ভাবে বলে, দোষের কথা ভাবা যায় না, তথাপি মনটা কেমন টনটন করে।

পাড়ায় এসব নিয়ে কথা হয়। শশীকে শুনিয়েও অনেকে বলে, 'বউটা শেষে বুড়ো ভামের পাল্লায় পড়লো!'......শশী কান দিতে চায় না, কিন্তু কথাগুলো অন্তরে বিঁধে থাকে।

কালু মুখুজ্জে আবার বললো, 'তুমি কি বলতে চাও, গোবরা ব্যাটা তাড়ি বেচে আর মদ চোলাই করে অমন একটা টানজিটার কিনেছে?'

শশী বললো, 'আমি কিছুই বলছি না কালুকাকা।'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'আরে এতে বলাবলির কী আছে? সবাই জানে গোবরার বউ দুবার কোমর দুলিয়ে পাড়া বেড়ালে অমন টানজিটার রোজ একটা করে কিনতে পারে।'

কালু মুখুজ্জে হা-হা করে হেসে উঠলো। শশীভূষণ জানে, পাড়ায় না, কালু মুখুজ্জের উঠোনে বেড়ালেই যথেষ্ট। কিন্তু কিছু না বলে, শশী আর কোনো কথা না শুনে, দ্রুত পুকুরের ধার দিয়ে মন্দিরের পাশ দিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

* * * *

সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। শশী গিয়েছিল গরুর ডাক্তারের কাছে, একটু মলম আনবার জন্য। বকনা বাছুরটার কানের কাছে দগদগে ঘা হয়েছে, কিছুতেই সারছে না। বাড়ি এসে সর্বেশ্বরীকে না দেখে দিদিকে জিজ্ঞেস করে জানলো, সে গিয়েছে কালু মুখুজ্জের বাড়ি রেডিওর গান শুনতে। শোনা মাত্র মনটা ক্ষুব্ধ হতাশায় ভরে উঠলো। আজ ওবেলাই পঞ্চায়েত-বাড়ির সামনে গোবরা বাউরির ট্রানজিস্টার কেনার কথা হচ্ছিল। শশীরও মনে মনে একটা ইচ্ছা ছিল, এ বছরের ফসল উঠলেই চোখ-কান বুজে বর্ধমান শহর থেকে একটা ট্রানজিস্টার কিনবে। শ-দেড়েক টাকা দরকার। শশীর কাছে সেটা খুব সহজ ব্যাপার না। কিন্তু এই মুহূর্তে হতাশা ক্ষোভ ও একটা অভিমানাহত ব্যথা তাকে এমন ব্যাকুল করে তুললো, সে স্থির থাকতে পারলো না। বাছুরের গায়ে মলম দিতে ভুলে সে সোজা চলে গেল মুসলমান পাড়ায় নেয়ামতের কাছে।

নেয়ামত ধনী কৃষক, নগদ টাকার অভাব নেই। লোকের প্রয়োজনে জমিজমা বন্ধক রেখে ধার-কর্জ দেয়। ধানজমির দাম এখন অগ্নিমূল্য, কম করে তিন হাজার টাকা বিঘা। শশী তার ছেষট্টি দাগের এক বিঘা জমি বন্ধক রেখে দুশো টাকা ধার করলো। একমাত্র কড়ার, এবারের ফসল উঠলেই টাকাটা শোধ দেবে। কালু মুখুজ্জের থেকে নেয়ামত লোক ভালো না, একটু কম চশমখোর। সামান্য সুদের বিনিময়ে শশীকে টাকা দিল।

শশী বাড়ি গিয়ে খুলে কিছু বললো না। পরের দিন সকালবেলা কাজের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে বর্ধমান পৌঁছুতেই দুপুর। গ্রামের একজনই চেনা লোক সেখানে ছিল, বর্ধমানে মুদির দোকানদারি করে। শশী তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিও কিনলো। দোকান থেকেই ট্রানজিস্টারটি পিজবোর্ডের বাক্সে বেঁধেছেঁদে দিল। বস্তুটির দিকে একবার তাকিয়ে শশীর চোখের সামনে সর্বেশ্বরীর মুখ ভেসে উঠলো

আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। খাওয়াটা সারতে হলো হোটেলেই। গ্রামে যখন ফিরলো তখন অন্ধকার নেমেছে। বাঁশঝাড় আর পুকুর-পাড়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে।

শশী বাড়িতে এসে ঢুকলো। উঠোনে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে ঝংকৃত বাজনার সঙ্গে গান শোনা যাচ্ছে। কে গান করে!

শশী দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। সর্বেশ্বরীর গা ধোয়া, শরীরে ধোয়া শাড়ি জামা। মাথায় ঘোমটা নেই, খোঁপা চিকচিক করছে। তাকে ঘিরে বসে আছে দিদির ছেলেমেয়েরা। সর্বেশ্বরীর কোলের সামনে একটি টানজিস্টার। সে তন্ময় হয়ে গান শুনছে, ঠোঁটের কোণে মুগ্ধ হাসি, চোখে যেন স্বপ্নের আবেশ। শশীর পায়ের হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে, সর্বেশ্বরী দরজার দিকে তাকালো। শশীকে দেখেই বলে উঠলো, 'কোথায় গেছলে গো? সেই সকালে বেরিয়েছ, এখন ফিরলে?'

শশী যেন সেকথা শুনতে পেলো না, জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কোথায় পেলে?'

সর্বেশ্বরী হেসে কালু মুখুজ্জের মতো উচ্চারণে বললো, 'এ টানজিটারটা? মা গো! আর বলো না, কালুকাকা কিছুতেই শুনলো না, নিজে বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে গেল। বলে গেল, 'বউমা, এটা তোমাকে দিলাম, তোমার জন্যই এটা কিনে এনেছি।'

পরমুহূর্তেই সর্বেশ্বরীর দৃষ্টি পড়ে শশীর হাতের দিকে, জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার হাতে ওটা কী গো?'

শশী তার দু হাতে ধরা বাক্সোটির দিকে একবার তাকালো, তারপরে দাওয়া থেকে নেমে, উঠোন পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে অন্ধকারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। পিছনে সর্বেশ্বরীর স্বর শোনা গেল, 'কী হলো, আবার কোথায় যাচ্ছ?'

শশী দূরের মাঠের দিকে তাকালো। মন্দিরের পাশে পুকুরের

নিস্তরঙ্গ কালো জলে তারার ঝিকিমিকি। সে ব্যাকুল বা চঞ্চল হলো না। একটা যন্ত্রণা বুকের মধ্যে সাপের মতো নিষ্কুণ্ডল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছে, নেমে গেল পুকুরের জলের সামনে। মনে মনে বললো, 'সর্ব, তুমি সকলের সঙ্গে সকলের মতন হতে পারো, আমি পারি না। আমি আমার মতোই থাকবো, কিন্তু এ ভার আর সইতে পারি না।'

শশী নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে ছোট যন্ত্রটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তথাপি চোখের সামনে জেগে রইলো সর্বেশ্বরীর প্রতিমার মতো মুখ।

অসহায়

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ কথাটা শোনা ইস্তক কেবলই ভাবছি, নারী-ঘটিত বিষয়ে নিজের ভূমিকাটি একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

কথাটা নিজের কাছেই কিঞ্চিৎ হেঁয়ালির মত লাগছে। নারী-ঘটিত বিষয়ে নিজের ভূমিকা, এর আবার ঝালিয়ে নেবার কি আছে? নারী মাতা, নারী ভগ্নী, নারী স্ত্রী, নারী কন্যা—এগুলোর সঙ্গে পর পর সাজিয়ে দিলেই নিজের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমি এসব ভূমিকার কথা ভাবি নি। ঠোঁটের কোণে হাসিটা চেপেই বলছি, এ ভূমিকাগুলো তো নিতান্ত মামুলী। এই সব ভূমিকাই কি সব? ভাবলে নারী জাতিকেই ছোট করে দেখা হয় না কী?

আমার এক অকৃতদার বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। সে ইচ্ছা করেই এতোখানি বয়স অবধি অকৃতদার রয়ে গিয়েছে তা ভাববার কোন কারণ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদেরই যে কেবল জীবনে বিয়ে ঘটে ওঠে না তা সত্যি না। দেখাশোনা উদ্যোগের অভাবে কতো অকৃতদার পুরুষের দীর্ঘশ্বাসে যে সংসারের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, সে খবর কে-ই বা রাখছে। আমার এই বন্ধুটির অবস্থা সেই

রকম। এখন সে কলকাতার বাইরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করছে। বেশ কিছু বৎসর আগে এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ীর আড্ডায় রীতিমতো একটি দার্শনিক প্রশ্ন উঠে পড়েছিল, 'মানুষ কী চায় ?'

শিক্ষক বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিল, 'মানুষ চায় মেয়েমানুষ।'

তার পরেই যত্তো কূটতর্ক শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক-পত্নী অধ্যাপিকা নন বটে, বাঙলার সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ.। তিনি বলে উঠেছিলেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ! মানুষ বলতে তাহলে তুমি কেবল পুরুষদের বোঝাচ্ছ ? মেয়ে-মানুষ মানে কী ? পুরুষরা মানুষ, আর আমরা মেয়ে মানুষ ?'

শিক্ষক বন্ধুটি করজোড়ে বলেছিল, সে মোটেই তা বলতে চায় চায় নি। তার ভাষাটা অর্বাচীন বটে, আসলে সে বলতে চেয়েছিল পুরুষ কেবল নারী। মানুষের কথাটা বলা তার ভুল হয়েছে।

এ বিষয়েও নানারকম তর্ক উঠেছিল। সে-সব তর্কের কোন শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না।

বন্ধুটির সেই অকৃত্রিম উক্তিটি আমার অদ্যাবধি কানে লেগে আছে, 'মানুষ চায় মেয়েমানুষ।' অর্থাৎ 'পুরুষ চায় কেবল নারী।'

কথাটা মনে পড়লেই সেই বন্ধুর মুখটি আমার মনে পড়ে, আর সত্যি বলতে কি, মনটা খুবই ভার হয়ে ওঠে। ল্যাঙ্গুয়েজের আড়াল দিয়ে এরকম খাঁটি সত্য কথা, যা প্রাণ থেকে আপনি বেরিয়ে পড়ে, আজকাল উঠেই যাচ্ছে। কথা বলেও সুখ নেই।

যাই হোক, শিক্ষক বন্ধুটির উক্তি আমি যেভাবে উল্লেখ করলাম, অনেকের মনে হতে পারে, এতে নারীজাতিকে খাটো করা হয়েছে। আমার কিন্তু আদৌ তা মনে হয় নি। বন্ধুটির বিয়ে হলে সে স্ত্রৈন হতো কী না সে বিচার করে কোন লাভ নেই। সংসারে এতো প্রার্থিত বস্তু থাকতেও যে এক কথায় বলতে পারে, পুরুষ চায় কেবল নারী, তার দূরদৃষ্টির কোন তুলনা নেই। আদতে সে বলতে চেয়েছিল, নারী ছাড়া জীবন নেই। আমি জানি, তথাপি প্রশ্ন

উঠবে, পুরুষ যে কেবল নারী চায় সে চাওয়ার উদ্দেশ্য আর ভঙ্গিটা কী তার ব্যাখ্যা দরকার! নারী ছাড়া যে জীবন নেই, সেই জীবনটার অভিসন্ধিই বা কী? তার মানে, সেই ভূমিকার কথাই আসছে।

অন্যদের কথা থাক, আমার নিজের ভূমিকার কথাই ভাবছিলাম। অবিশ্যিই একজন লেখক হিসেবেই আমার ভূমিকার কথাটা মনে হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, আমি নাকি নারী-বিদ্বেষী। আবার মহিলাদের কাছেই এর বিপরীত কথা শুনেছি, এমন কি মহিলার সঙ্গে মহিলার তর্কও। যে তর্কে আমার ভূমিকা গৌন। কিন্তু প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনেছি, নিজেকে বিচারের জন্য। কখনো বুঝতে পারি নি, আমি সত্যি নারী-বিদ্বেষী বা নারী-পূজারী।

এক এক সময় মনে হয় প্রসঙ্গটা নিতান্তই অর্থহীন। তৈলধর পাত্র না পাত্রধর তৈল, এরকমই একটি বিতর্কিত অর্থহীন প্রসঙ্গ যার কোন শেষ নেই। তার চেয়ে আমি একটা সত্যি ঘটনা বলি। ঝাণ্ডা কাঁধে বীরাঙ্গনাদের আমি বরাবরই শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, কিন্তু এতো ভয় পাই, শনিঠাকুরের মতো তাঁদের আসন বাইরেই রেখেছি। ঝাণ্ডার থেকে ঝাঁটার আমার ভয় যেমন, ভালবাসাও তেমনি। অতএব কবুল করতেই হয় আমি বড় কথার মানুষ না, গৃহাঙ্গনেই আছি।

আমার এক বন্ধু, ধরা যাক তার নাম বিরাজমোহন। প্রথম জীবনে সরকারী কর্মচারী, এখন মডার্ন হিস্ট্রির অধ্যাপক।

ও যখন চল্লিশ পার হয়ে গেল, ধরে নিলাম বিয়ে-টিয়ে আর করবে না। একই কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক হরিনাথবাবুর বয়স পঞ্চান্ন, তিনিও অকৃতদার। বিরাজ আর হরিনাথবাবু একেবারে হরিহরআত্মা। কলেজে প্রফেসার্স-রুমে দুজনের এক কোণে পাশাপাশি চেয়ার। যতক্ষণ কলেজে, ততক্ষণ দুজনের ছাড়াছাড়ি নেই। কেবল ক্লাস নেওয়া ছাড়া।

একটা কথা মনে রাখতে হবে ছুজনের মধ্যে যদি ভূমিকা ভাগাভাগি করতে হয় তাহলে হরিনাথবাবুর ফার্স্ট পার্ট, বিরাজ সেকেণ্ড পার্ট। হরিনাথবাবু বিরাজকে বন্ধু হিসাবে যেমন ভালবাসেন তেমনি স্নেহ করেন। বিরাজ তেমনি হরিনাথবাবুকে শ্রদ্ধাও করে। তা বলে যে ছুজনের মধ্যে প্রাণখুলে কথা হয় না তা না। স্নেহ-শ্রদ্ধা বন্ধুত্বের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

হরিনাথবাবু একলা কখনো চা খান না, ক্যান্টিনের খাবারও খান না। সব সময় ছুজনের জন্য খাবার আসে। বিরাজের পয়সা দেবার উপায় নেই, হরিনাথবাবু রীতিমতো ঠোঁট উল্‌টে অভিমান করেন। মনে হয় তাঁর চকচকে টাক বেয়েই হয়তো অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

বিরাজ ক্ষমা-টমা চেয়ে কোনরকমে মানিয়ে নেয়। সেই জন্যই হরিনাথবাবুকে ফার্স্ট পার্ট বলা হয়েছে। কেবল যে কলেজের চা-জল খাবারের ব্যাপারে তা না, সিনেমা থিয়েটার থেকে শুরু করে রিকশা ভাড়া পর্যন্ত বিরাজের একটি পয়সা খরচ করার উপায় নেই। বিরাজ প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করলেও এখন আর করে না। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।

বিরাজ আস্তে আস্তে আমাদের অর্থাৎ বিবাহিত বন্ধুদের একেবারেই ত্যাগ করছে। আগে যাও বা বিকেলে সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে বাড়ি আসতো, তাও আর আসে না। শুনি হরিনাথবাবুর সঙ্গেই অষ্টপ্রহর কাটে। আমরা সকলে জেনেছি ছুজনেরই প্রতিজ্ঞা, কনফার্মড ব্যাচেলর হিসেবেই জীবন কাটিয়ে দেবে।

ভালো। কিন্তু আমাদের ত্যাগ করার কী আছে ?

বোধ হয় সঙ্গদোষের বায়ুর বিরাগে। বিরাজের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হলেও সে এরকম কথাই বলে। 'বউ সংসার ছেলেমেয়ে গুলি মারো।' এটা ওর মুখে প্রায় লেগেই থাকে। 'বেশ ঝাড়া হাত-পা আছি বাবা, ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই।' কথায় কথায় একথা বলে।

হরিনাথ বাবু সঙ্গে থাকলে ঠোঁট উল্টে হেসে বলেন, 'এসব কথা বলতে যাও কেন? নিজের আনন্দ নিজের মধ্যেই রাখো। আমরা হলাম আলাদা জাত।'

হরিনাথবাবু বিরাজকে অনেক রকম উপদেশ দেন, মাঝে মাঝে বকুনি দেন, শাসনও করেন। বিরাজ আগে ছিল খুব রসিক ধরণের। কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা মজার গল্প ওর মুখে লেগেই থাকতো। অল্প-স্বল্প শ্ল্যাং-ও ওর মুখে ফুটতো সব সময়। ফলে হাসি-ঠাট্টা জমতোই বেশী। কিন্তু হরিনাথবাবু ওকে একেবারে ভদ্রলোক করে ফেলেছেন। একটি শ্ল্যাং শব্দও ওর মুখে আজকাল আর শোনা যায় না।

বিরাজের চেহারা-স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু ওর চুল অকালে পেকে গিয়েছে। কুড়ি-বাইশ থেকেই দেখছি ওর মাথায় পাকা চুল। এখন চল্লিশে তো মাথা প্রায় সাদা।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো, সেলুনের নরসুন্দরের সুন্দর সুন্দর কথা শুনে বিরাজ একবার চুলে কলপ করে ফেললো। বিরাজের মাথার কালো কুচকুচে চুল দেখে হরিনাথবাবু তো ওকে প্রথমে চিনতেই পারেন নি, চিনতে পেরে এমন আঘাত পেলেন একটা ক্লাসও আর নিতে পারলেন না। প্রিন্সিপ্যালকে শরীর খারাপ জানিয়ে বাড়ি চলে গেলেন, বিরাজের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না।

বিরাজের অবস্থাও তথৈবচ। ও-ও ক্লাস নিতে পারলো না, কিন্তু নিজের বাড়ি না গিয়ে গেল হরিনাথবাবুর বাড়ি।

ওকে দেখেই হরিনাথবাবু ধুতির কোচা দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন, বললেন, 'জীবনে এমন আঘাত আমাকে আর কেউ দেয় নি।'

বিরাজ শুধু পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলো না, প্রতিজ্ঞা করলো এমন কাজও আর কখনো করবে না। হরিনাথবাবু ওকে ক্ষমা করলেন, কিন্তু আঘাতটা সামলাতে সময় লাগলো। বিরাজের

মাথার চুল সাদা হতে যতোদিন সময় লাগলো, আঘাতটা ততোদিনই বেজেছিল।

এই বিরাজ আবার হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। শীতের ছুটিতে বেড়াতে গেল দিল্লীতে এক আত্মীয়-বাড়িতে। ফিরে এসে যখন দেখা করলো তখন ওর হাতে একটি খামের ওপরে লেখা 'প্রজাপতয়ে নমঃ' এবং হলুদের দাগের চিহ্ন।

বিরাজ বিয়ে করতে চলেছে। অঘটন ঘটেছে দিল্লীতে। কী করে যে ঘটলো ও নিজেও জানে না, কিন্তু মহিলাকে ওর পছন্দ হয়েছে। অতএব, হ্যাঁ।

অতএব তো বোঝাই গেল, এখন হরিনাথবাবু কী বলছেন? বিরাজ গভীর উদ্বেগে বললো, 'ওঁকে তো বলতেই পারছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নিমন্ত্রণ করবি না?'

'নিমন্ত্রণ!' বিরাজ বিষম খেয়ে বললো, 'সামনেই যেতে পারছি না, লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। উনি শুনলে যে কী করবেন তাই ভাবছি। একটা সাংঘাতিক অঘটন না ঘটে যায়।'

অঘটন ঘটলো। হরিনাথবাবু প্রথমে বিরাজের সঙ্গে কথা বন্ধ করলেন। দেখতে দেখতে শুকিয়ে উঠলেন, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। তারপরে কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

সত্যি বলতে কি, অনেকের সমবেদনা হরিনাথবাবুর জন্যই বেশী দেখা গেল। বিরাজ কেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছিল যা রাখতে পারবে না? আর তার জন্য একটা মানুষের জীবনটাই নষ্ট!

বিরাজের বৌভাতে গিয়ে দেখলুম ওর বউটির বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে। দিল্লীতেই মানুষ। বেশ হাসিখুশী, স্বাস্থ্যবতী আর সহজ। আমি বিরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কী ঘটলো যে তুই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলি?

বিরাজ অনেক ভেবে বললো, 'আসলে কী জানিস, চন্দ্রার (স্ত্রীর নাম) সঙ্গে আলাপের পর আমি যেন কেমন ইয়ে—মানে ভেতরে ভেতরে হেল্‌প্‌লেস্‌ হয়ে পড়লাম।'

হেল্‌প্‌লেস্‌!

বিরাজ আরো বললো, 'এমন হেল্‌প্‌লেস্‌ যে কোনরকমেই নিজেকে হেলপ্‌ করতে পারলাম না।'

চমৎকার! কথাটার যে কী মানে করবো বুঝতে পারলাম না।

এ ঘটনার বছর খানেক পরে শিলং থেকে ফিরছিলাম। গৌহাটি বিমান বন্দরে আমি অপেক্ষমাণ। লাউঞ্জে বসেছিলাম।

আমার মুখোমুখি একটি দম্পতি বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গলায় টাই এবং স্যুটেড-বুটেড। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে পারে। গোঁফদাড়ি কামানো, ঝকঝকে মুখ, চোখে সান-গ্লাস। ভদ্রমহিলাও নানা বর্ণের ছাপা সিল্‌ক শাড়ি পরা। মাথার সামনের চুল পাতলা হলেও পিছনের খোঁপাটি বিরাট। তাঁর সব কিছুই রীতিমতো আধুনিক। বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ যাই হোক, ঠোঁটে রঙ মেখেছেন। হাতের দশটি নখই রঙ-মাখা। পায়ে হাইহিলের জুতো, তাঁদের কথাবার্তার ভাষা মিডিয়াম বাঙলা হলেও ইংরেজী শব্দই দশ আনা। যদিও কথা তাঁরা কমই বলছিলেন।

রানওয়ের দিকে তাকিয়ে নীরবেই সময় কাটছিল। তার মধ্যেই কিছু কথাবার্তা। আমার হাতে বই।

ভদ্রলোক হঠাৎ মাথার টুপি খুলে টাকে হাত দিয়ে চুলকোতেই চেনা মুখখানি ভেসে উঠলো। হরিনাথবাবু! আমাদের সেই কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিরাজের বন্ধু। আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল, 'হরিনাথবাবু!'

'ইয়েস!' হরিনাথবাবু ভ্রূকুটি-বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। চিনতে একটু সময় লাগলো, তারপরে বললেন, 'আরে আপনি রাইটার মশাই! কোথায় চললেন?'

বললাম, 'কলকাতায়।'

কিন্তু আমার দৃষ্টি ঘন ঘন চলে যাচ্ছে পাশের মহিলার দিকে।

হরিনাথবাবু তা লক্ষ্য করলেন, ইংরাজীতে বললেন, 'মীট মাই ওয়াইফ মিসেস চক্রবর্তী।' বলে আমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আমার কিছু বই পড়া আছে ওঁর, পরিচয় হয়ে ওঁর ভালো লাগল ইত্যাদি।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা যে আকাশ থেকে পড়ার চেয়েও বেশী। হরিনাথবাবু বিবাহিত, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী! পৃথিবীতে এমন অঘটনও ঘটে? এবং তার রহস্যটা কী?

তা জানার কোনো উপায় আছে বলে মনে হলো না।

প্লেন আসতে দেরি করছিল। কথায় কথায় জানা গেল, হরিনাথবাবু এখন শিলং-এ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং তাঁর স্ত্রীও সেই কলেজেরই লেক্‌চারার।

তা তো বুঝলাম! কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকলো কেমন করে?

জানা গেল সেই রহস্য।

আমি লেভেটরি থেকে বেরোচ্ছি, হরিনাথবাবু ঢুকছেন। অপেক্ষা করলাম তাঁর জন্য। বেরিয়ে আসার পরে বললাম, 'বিরাজের ওপর এখন নিশ্চয়ই আপনার আর রাগ নেই?'

হরিনাথবাবু ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। ওর ওপর আমার রাগ কোনদিন যাবে না। ও আমার বুকে শেল হেনেছে।'

তথাপি তিনি বিবাহিত! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

তিনি আবার বললেন, 'হি ইজ এ ট্রেইটর।'

তিনি কি সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতেই বিয়ে করেছেন? আমি হাওয়াটা হালকা করার অভিপ্রায়ে বললাম, 'আপনাদের দুজনকে দেখে বেশ ভালো লাগলো।'

হরিনাথবাবু হেসে বললেন, 'আমাদের—মানে আপনি তন্দ্রার কথা বলছেন? ওহ্, শী ইজ এ ভেরি গুড-হার্টেড লেডি।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবতেই পারি নি আপনি আবার কখনো—।'

'বিয়ে করবো!' বাধা দিয়ে হরিনাথবাবু বলে উঠলেন। এবং হেসে উঠে আবার বললেন, 'আমিও কি কখনো ভেবেছি বিয়ে করবো? কী করে যে হোল বুঝতেই পারলাম না! আই মীন, হোয়েন আই মেট ভদ্রা—হোয়াট কুড আই সে, সামহাউ আই বিকেম হেল্‌প্‌লেস্‌! হ্যাঁ বুঝলেন, হেল্‌প্‌লেস্‌—একটা অদ্ভুত ফিলিংস্‌! আমি ভেতরে ভেতরে কেমন হেল্‌প্‌লেস্‌ হয়ে গেলাম।'

কার কথা শুনছি! বুঝতে পারছি না। হরিনাথবাবুর, না বিরাজের, না কি আমারই? আসলে অনেক নাটের গুরু হয়েও আমি—আমাদের ভূমিকা কি নারী-ঘটিত বিষয়ে একান্তই অসহায় নয়?

কথাটা ব্যঙ্গার্থে না, নারী-পুরুষের পরস্পরের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ বা না, দুই-ই বাদ; বিদ্বেষ এবং পূজাও তাই।

সম্পর্কের মধ্যেই পরস্পর বোধ হয় অসহায়।

জীবিকা

উন্মাদটিকে অনেককাল ধরেই চিনতাম। বদ্ধ উন্মাদ বা ক্ষ্যাপা পাগল বলতে যা বোঝায় এ মানুষটা ঠিক সেইরকম না। ঠিকমতো বলতে গেলে, আমাদের এই ছোটখাটো শিল্পশহরে, বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায়, স্টেশন দোকান বাজার অঞ্চলে, অনেক সময়েই যেমন নানা পাগলের দেখা মেলে, আমি যার কথা বলছি, তাকে ঠিক সেই বিভাগেও ফেলা যায় না।

যখন স্টেশনের সামনে আমাদের প্রিয় আড্ডার জায়গাগুলোতে বসে আমরা বন্ধুরা আড্ডা দিই, ডবল হাফের পর ডবল হাফ (চা) চলতে থাকে, তৎসঙ্গে সিগারেটের ভস্মনাশ এবং নানাবিধ আলোচনা, যে সব আলোচনার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই বা প্রসঙ্গের কোনো বিধিনিষেধ নেই, কারণ হয়তো লেনিনের রাজনৈতিক চিন্তার থেকে অনায়াসেই ব্যালেরিনা উলিয়ানোভার কথা

উঠে পড়তে পারে, কিংবা গান্ধী-দার্শনিকতা থেকে হয়তো কোনো চিত্রনটীর প্রসঙ্গ, অথবা শহরের কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রসঙ্গ থেকে কোনো চটুল মেয়ের চুটকিতে—অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই প্রায় খৈ ভাজার মতো (নেই কাজ তো !), তখন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যেন পাগলের মিছিল চলে যেতে থাকে।

বিষয়টা ভাবার মতো নয় কী ? আমাদের আলোচনার এটাও একটা প্রসঙ্গ, এতো পাগল আসে কোথা থেকে, যায়-ই বা কোথায় ? কারণ এই সব পাগলদের কখনোই বেশি দিন দেখা যায় না।

আমাদের শহরের জংশন স্টেশনটা যেন জীবনেরই একটা প্রতীক। এখানে যে সুস্থ-মস্তিষ্ক যাত্রীরাই কেবল ভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য ট্রেন বদল করেন তা নয়, ভাসমান পাগল-সমাজও ভাসতে ভাসতে কিছুদিনের জন্য আমাদের এই শহরে ঘুরে বেড়ায়, তারপরে আবার এক সময়ে উধাও হয়ে যায়। পুরনো মুখের জায়গায় নতুন মুখ দেখা দেয়।

সেই সব পাগল, এবং অবিশ্যিই পাগলীও, তাদের প্রত্যেকের বেশভূষা আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনবরত বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে আঙুল নেড়ে নেড়ে নানা সংকেত করে। যেন গোটা আকাশটাই তার কাছে একটা অঙ্কের খাতা, আর সে নিঃশব্দে জটিল অঙ্ক নানাভাবে কাটাকুটি করে ফল মেলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সীমাহীন সেই সংখ্যাতত্ত্বের ফল কোনো দিন মিলবে বলে মনে হয় না।

কেউ বা ক্ষ্যাপা কাপালিকের মতো রুক্ষ চুলের গোছা, গায়ে নোংরা মেখে বিকট চোখ-মুখ করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শাসিয়ে চলেছে। আর সে সব ভাষারই কী বৈচিত্র্য ! খবরের কাগজে তো আপনারা রোজই পড়ছেন, কোন্ অসাধু ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছে, জনসাধারণকে শুষে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে।

কিন্তু আপনি হয় তো দেখলেন, চোখ-মুখ পাকিয়ে একটা পাগল চিৎকার করে বলে চলেছে, 'ভেবেছ এমনি এমনি পার পাবে? আমার লাখ টাকায় ঘা দিয়েছ, ঠাকুরের দেড়শো ভরি সোনা গায়েব করেছ। শালা তোমার কলজে আমি তেল-নুন দিয়ে ভেজে খাবো। না না, ছেড়ে দাও, শালাকে আজ দেখে নিচ্ছি। মার শালাকে, মার মার মার।···কে ডাকছে? ওখেনে বেড়ার ফাঁকে কে দাঁড়িয়ে? আমি এসেছি গো, ও মা, আমি এসেছি।'

পাগলের প্রলাপ ছাড়া এসব কিছুই না। যদি সন্দেহ করেন, তা হলে তদন্ত করা যায়।

কথাগুলো শুনলে মনে হয়, এ নিতান্তই হয়তো প্রলাপ নয়। কিন্তু এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। কথায় আছে, পাগলে কী না বলে!

ধরুন আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছেন, হঠাৎ একজন ভদ্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত-চোখ লোক আপনার সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'রমাকে দেখেছেন, রমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, ফরসা, চোখ-মুখ সুশ্রী, বয়স সাতাশ-আটাশ, দোষের মধ্যে ফিক ফিক করে হেসে ওঠে, আর তাই দেখেই লোকেরা যা খুশি তাই ভেবে নেয়। এবার বুঝেছেন তো, কোন্ রমার কথা বলছি?'

আপনি নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যাবেন, অবাক চোখে ভদ্রলোকের উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলতে উদ্যত হবেন, 'না তো, এরকম কোনো মহিলাকে—'

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি সেকথা বলবার সুযোগ পাবেন না, তার আগেই দেখবেন, সেই উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখ আর চোখ তীব্র সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে আর চিৎকার করে বলছে, 'তবে রে স্কাউণ্ড্রেল, মনে করেছ ওরকম চাঁদপানা মুখ করে থাকলেই হবে? সিম্পলি আই উইল চেঞ্জ দ্য জুয়োগ্রাফি অব য়োর ফেস!'

কী রকম বুঝলেন? এ্যান্টি-ক্লাইমেকস্!

না, লোকটি আপনার মুখের ভৌগোলিক আকারের কোনো পরিবর্তন করবে না, কেবল তর্জনী তুলে এই বলে শাসিয়ে চলে যাবে, 'ওয়েইট্‌, আই উইল গিভ য়ু দ্য লেসন।'...

আপনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, আশেপাশের লোকেরা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে এবং বুঝতে পারলেন, আপনি একটি পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন।

পাগলদের এরকম বিবরণ দিতে গেলে, তার শেষ পাওয়া কঠিন। তা হলে একটা পাগলের মহাভারত লিখতে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে কোনোদিনই সেরকম একটি মহাপাগল বেদব্যাস হওয়া সম্ভব না। পাগল নিয়ে কেউ যদি কখনো রিসার্চ করেন, সেকথা নিশ্চয়ই আলাদা। রিসার্চ যে করা হচ্ছে না, তাও আমি বলছি না। মনোবিকলনের নানা চর্চাই তো হচ্ছে।

সেরকম কোনো পাণ্ডিত্যের বিষয়ে আলোচনায় আমার অভিরুচি নেই। কারণ আমার অযোগ্যতা। গাইয়ে বকিয়ে হাসকুটে ক্রুদ্ধ পাহাড়ের মতোই স্তব্ধ নির্বাক শান্ত গম্ভীর কামুক নানা শ্রেণীর পাগল আমরা সকলেই দেখে থাকি। এমন কি অতি ত্যাঁদড় হাড়ে হারামজাদা পাগলের সাক্ষাৎও অনেক সময়েই পাওয়া যায়।

এরকম একটি পাগলের কথা কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি একবার লিখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জন্য অশ্রুপাত না করে পারা যায় নি। তার মৃত্যুর পরে আমার মনে হয়েছিল, আমাদের মফঃস্বল শহরের সমাজ-চরিত্রের একটা স্থান চিরকালের জন্য শূন্য হয়ে গেল, যা আর কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। হয় নি।

আপাততঃ এসব ভূমিকা থাক। আমি যে পাগলটির কথা বলতে চাইছিলাম, তার কথাই বলা যাক।

আমাদের পাড়ার কাছেই। এক নামকরা ডাক্তারের বাড়িতে একটি পাগলকে রোজই প্রায় দেখতে পাই। পাগলটির সঙ্গে

ডাক্তার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের বিরাট বাড়ি। ভিতর বাড়ি, বাইরের বাড়ি, ডিসপেন্সারি, গ্যারেজ সব মিলিয়ে এতো জায়গা, পাগলটির পক্ষে এক কোণে পড়ে থাকার কোনো অসুবিধা নেই।

অন্যান্য বিষয় বলার আগে পাগলটির চেহারার বর্ণনাটা দেওয়া যাক। নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ তার গড়ন, শক্ত পেটানো পেশীবহুল চেহারা। বয়স তার কতো, অনুমান করা কঠিন। মাথার চুলে পাক ধরেছে অনেক দিন। শক্ত চৌকো মুখে বেশ কিছু ভাঁজ পড়েছে। কপাল বেশ চওড়া, ভুরুতে বিশেষ চুল নেই, চোখ দুটো ছোট, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সব সময়েই প্রায় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। খড়্গ নাসা এবং তার চিবুকে একটি ভাঁজ আছে। এক এক সময় মনে হয়, তার বয়স চল্লিশ হতে পারে, কখনো মনে হয় ষাট হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র না।

কমপক্ষে দশ-বারো বছরের ওপর তাকে দেখছি, চেহারার পরিবর্তন বিশেষ দেখি নি। কখনো হয়তো মাথা ভরতি চুল জমে ঘাড় বেয়ে নামে। তারপরেই আবার দেখা যায় একেবারে কদম ছাট। চুল কাটা বোধ হয় যান্মাসিক ব্যবস্থা। গোঁফদাড়ি এক সপ্তাহ থেকে পক্ষকালের মধ্যে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ বাদ দিলে, বছরের ন'মাসের পোশাক ছেঁড়া-ঝুলি। বেঢপ বেমাপের বিবর্ণ ফুল প্যান্ট আর বহু ছিদ্রবিশিষ্ট গেঞ্জি। শীতের সময় মোটা, বহু সেলাই তাপ্‌পী মারা একটি হাফসার্ট। তার কোনো নাম আছে কী না আমি জানি না, শুনি নি কখনো। পাগলা বলেই তাকে লোকে ডাকে। অথবা শুধুই পাগল। এটা হলো বাড়ির লোকের ডাক।

বাইরে লোকেরা ওকে নানা নামে ডাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'লাট'। এই ডাকের মধ্যে তার আবরণের কিছুটা মিল আছে, যারা ডাকে তাদের কিছু কৃপাও আছে। আর একটি নাম 'গরু চোর'। কী করে এই নামের উৎপত্তি, আমি তার কোনো হদিস

জানি না। পাড়ার ছোট ছেলেরা যখন তার পিছনে লাগে, তখন চিৎকার করে তারা এই নামে ডাকে, আর লাগাতার চেঁচাতে থাকে। তখন কেবল 'গরু চোর' না, 'আলু চোর' 'পটল চোর' 'বেগুন চোর' 'ঝিঙে চোর' নানান কিছু শোনা যেতে থাকে।

পাগলের চেহারা তখন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা কংক্রিটের মতো শক্ত করে, ক্ষ্যাপা মহিষের মতো তেড়ে আসে। হুংকারে আশেপাশের বাড়ির দরজা-জানালা কেঁপে ওঠে। রাস্তার কুকুরটা পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু যে সব কুচোকাঁচাগুলো তার পিছনে লাগে, সেগুলো অমিত সাহসী বিচ্ছুর দল। তাড়া খেয়ে ওরা পিঠ্‌টান দেয় বটে, একেবারে চলে যায় না। বরং ওদের মজার সমুদ্রে জোয়ার লাগে। ওরা আরো চেঁচাতে থাকে। কেবল যে চেঁচায় তা নয়, রাস্তার থেকে ইঁট-পাটকেল নিয়ে ছুঁড়তে থাকে। তাও বেশ মোক্ষম। পাগলের গায়ে মাথায় লাগে। সেও তখন থান ইঁট নিয়ে তাড়া করে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই থান ইঁট যদি কচিকাঁচাগুলোর মাথায় কোনো দিন পড়ে, আর রক্ষে নেই। একটা খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভরসার কথা, পাগলের হাত থেকে কোনো দিনই থান ইঁট ছুটে আসে নি, কারোর মাথাও ফাটে নি। সে কেবল প্রাণ-চমকানো হুংকার দিতে থাকে। আর হুংকার দিতে দিতেই গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

পাগলের আচরণ এমনিতে খুব একটা ক্ষ্যাপাটে নয়, তবে রোখাচোখা। হয়তো বাড়ির গিন্নী ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ও বাবা পাগল, বেচনকে একবারটি ডেকে দে!'

পাগল খিচিয়েমিচিয়ে বলে ওঠে, 'বেচন কে, আমি তা জানি না।'

গিন্নীও তখন ধমকিয়ে বলেন, 'মুখপোড়া, বেচন কে তুই জানিস না? ড্রাইভারকে ডাকতে বলছি!'

পাগল তেমনি মেজাজ নিয়েই বলে, 'সে কথা বললেই হয়।'

বলে বকবক করতে করতে চলে যায়, 'বেচন! ব্যাটা আর নাম খুঁজে পায় নি। বেচন! ড্রাইভার বললেই তো হয়। বেচন আবার কিসের নাম?'

এরকম উত্তেজিত ভাবে বকবক তাকে প্রায়ই করতে দেখা যায়, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

হয়তো গেটটা বন্ধ, স্বয়ং ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসে পাগলকে দেখে বললেন, 'এই, গেটটা খুলে দে তো!'

পাগল বলে উঠলো, 'কেন, এখন আবার গেট খোলার কী দরকার?'

অবস্থাটা অনুমান করতে পারেন!

ডাক্তারবাবু খাপ্পা হয়ে চিৎকার করেন, 'হারামজাদা, কেন গেট খুলতে হবে, সে কৈফিয়ৎ কী তোকে দিতে হবে? খোল্ আগে!'

ততোক্ষণে কিন্তু দরজা খোলা হয়ে গিয়েছে। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই পাগলের বিড়বিড় শুরু হয়ে যায়, 'খালি গাড়ি চড়ে বেড়ানো, আর গেট খোল্ গেট খোল্! খুলব না, দেখি আমাকে কে কী করতে পারে? আমার খুশি আমি খুলব না।'

নিতান্তই পাগলের প্রলাপ।

ডাক্তারবাড়ি যে পাগলের এই পাগলামি মেনে নিয়েছে তার প্রমাণ, আশ্রয় আর খাওয়া। তার পরিবর্তে এমন না যে পাগলকে বিশেষ কোনো দায়িত্বের কাজকর্ম করতে হয়। পাগলকে দিয়ে তা সম্ভব না, কেউ তা আশাও করে না। ধরে নেওয়া যায় করুণা-বশতই পাগলকে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন, দুবেলা খেতেও দেন।

কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, পাগলটি একটু মুডিও আছে। বিড়ি সে প্রায় সব সময়েই টানে। তার চোর দুর্নাম কখনো শুনি নি। তা হলে ধরে নিতে হয়, কিছু পয়সাও সে পায়। বিড়ি নিশ্চয়ই দোকানদারের কাছে চেয়ে পায় না। আমি দেখেছি, বিড়ি টানতে টানতে সে কখনো কখনো যেন গভীর কোনো চিন্তায় নিমগ্ন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন ভাবে। যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছে, এরকম একটি ভাব।

তখন আমাকেও ভাবনায় পেয়ে বসে, এমন গভীর ভাবে সে কী চিন্তা করতে পারে? তার কি বিশেষ কোনো অতীত আছে? সে-সব কি তার মনে আছে? সে কি সে-সব ভাবে? কী অতীত তার থাকতে পারে?

আমারই পাগল হওয়ার অবস্থা। কারণ একজন পাগলকে নিয়ে এসব ভাবার কোনো মানেই হয় না। পাগল পাগলই। তার ভাবনা-চিন্তাও একটা পাগলামি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী খোঁজে? এমন ভাবে মুখ তুলে নিরীক্ষণ করে, যেন সে অন্য কোনো গ্রহের জীবদের দেখতে পেয়েছে, এমনই অনুসন্ধিৎসা তার চোখে। তারপরেই হয়তো দেখা যায়, সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে।

লক্ষণীয় একটা বিষয়, সে মাঝে মাঝে ভীষণ ক্ষেপে যায়। কারোকে ক্ষ্যাপাতে হয় না। সে নিজে-নিজেই ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। যেন সে দারুণ আক্রোশে কারোকে শাসায় বা ধমকায়। মুখ বিকৃত করে দাঁত খিচোয়, পাড়ার কচি-কাঁচারা তার এই ক্ষ্যাপামির সুযোগ নেয়।

দেখেছি সে নিজে থেকে যখন ক্ষেপে যায় বা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, যা অনেকটা দার্শনিকের মতোই, তখন কেউ কিছু বললেও সে খেয়াল করে না। এমন কি দু'একটা ঢিল-পাটকেল ছুঁড়লেও সে কিছু বলে না। সে যেন টেরই পায় না।

কেন আমি এই পাগলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, এবার সে কথাতেই আসা যাক। সম্ভবতঃ আমারও এটা এক ধরনের মানসিক গোলযোগ বা পাগলামি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, একটা পাগলকে ভয় পাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে আমার বিশ্বাস, পাগলদের বোধ হয় সকলেই কম-বেশি ভয় পান। আমি একটু বেশি পাই। এই পাগলটিকেও আমি ভয় পাই।

বিশেষ করে তার ক্ষ্যাপা মূর্তির তো কথাই নেই, এমনিতেও তাকে আমি ভয় পাই। তার চাউনি ভঙ্গি সবই এমন রোখ-পাক করা, ভয় হয় ঠাঁই করে সে হয়তো আমাকে একটা ঘুঁষি কষিয়ে দেবে বা হয়তো একটা থান ইঁট ছুঁড়ে মারবে।

অনেকদিন এমন হয়েছে, হয়তো নিঝুম দুপুরে বা একটু বেশি রাত্রে একলা বাড়ি ফিরছি আর পাগলটাকে দেখতে পেলাম পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বা সামনে কোনো রকে বসে আছে, আমার পা আর উঠতে চায় না। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ি, তারপর আস্তে আস্তে পেছনে হাঁটা দিই। কী লজ্জার কথা!

একজন সঙ্গী না জোটা পর্যন্ত আমি একলা নির্জনে সেই পাগলের সামনে দিয়ে যেতে পারি না। মনে হয়, চোখ পড়লেই সে ভল্লুকের মতো আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর চোখ ঠিক পড়বেই। ভয়ের মনস্তত্ত্বটাই এই রকম। কিন্তু আমার এই ভয়ের কথাটা কারোকে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি নি। নিজেরই লজ্জা করে।

এক বর্ষার রাত্রে আড্ডা দিয়ে ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দেরি মানে রাত্রি এগারোটা বেজে গিয়েছিল।

সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। ইলশেগুঁড়ির ছাট, তার সঙ্গে পূবে বাতাসের ঝাপ্টা। রাত্রেও তার কামাই ছিল না। এমন দুর্যোগে আমি একটা ছাতা পর্যন্ত নিয়ে বেরোই নি।

সন্ধ্যেবেলায় একটু ধরল দেখে আশা করেছিলাম, রাত্রের দিকে বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু থেমে যাওয়া তো দূরের কথা, আরো যেন বাড়ছিল। লোকজন বা সাইকেল-রিকশা খুব কম চলছিল। রাস্তার কুকুর পর্যন্ত এমন দুর্যোগে বাইরে থাকতে চায় না, মানুষ কোন্ ছার। একমাত্র আমার মতো আড্ডাধারী জীবের পক্ষেই এসব সম্ভব।

আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম। কলকাতা শহর না, রাস্তার আলোগুলো এমনিতেই টিমটিমে। তার ওপরে অনেকগুলো আলো

জ্বলছিল না। বৃষ্টির রাতের রাস্তাটা রীতিমতো ভৌতিক মনে হচ্ছিল। আমার তখন একটিমাত্র চিন্তা, সেই পাগল! কিন্তু বাড়ি তো ফিরতেই হবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই চলছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার পিছনে পিছনেই আরো কেউ আসছে। একবার তাকিয়েও দেখেছি, সারা মাথায় গায়ে চটের মতো জড়িয়ে কেউ আসছে। কোনো গরীব শ্রমজীবী কোনো মানুষ হবে, ধরেই নিয়েছিলাম।

বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যখন আমাদের গলির মোড়ে এলাম লক্ষ্য করলাম, সেই পাগল কোথাও আছে কী না! সেই অবকাশে আমার পিছনের লোকটিও আমার পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথার থেকে চটের ঢাকনা সরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমার বুকে ধক করে উঠলো না কেবল, মনে হলো আমি মারা গিয়েছি। চটের ঢাকা দিয়ে সেই পাগল আমার সামনে। মনে হলো সাক্ষাৎ যমদূত আমাকে পিছন থেকে অনুসরণ করে আসছে।

আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে পিছন ফিরে ঝেড়ে দৌড় দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম, অতি বিনীত ভদ্র অমায়িক ভাষণ, 'আহা, একেবারে ভিজে গেছেন যে! এরকম বর্ষায় একটা ছাতাও নিয়ে বেরোন নি?'

অবাক যেমন হলাম, ভয় তার চেয়ে আরো বেশী পেলাম। পাগল এরকম অভাবিত কথা বলে! নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক ব্যাপার, অথবা মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, এই ভদ্র অমায়িক মিষ্ট ভাষণ হয়তো তাই। আমি কোনো জবাবই দিতে পারলাম না।

পাগল যে কোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের থেকেও সুস্থ ভাবে, অতি ভদ্রলোকের মতো ভাষায় আবার বললো, 'খুবই অবাক হয়েছেন,

বুঝতে পারছি। আপনাকে আমি চিনি। এভাবে জলে ভিজে অসুখ-বিসুখ করবেন না। আপনাদের জীবনের দাম আছে।'

আমার মাথা ভালো থাকবার কথা না, সত্যি খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। অবাক ভয় সব কিছুর স্তর আমি তখন অতিক্রম করে গিয়েছি। কিন্তু কথা? আমার স্বর বলে কিছু ছিল না।

পাগল দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। তার সেই বিকট মুখে একটি করুণ বিব্রত হাসি। বললো, 'আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বললাম, এ কথা কাউকে বলবেন না। পাগল হয়ে আছি, সব হারিয়ে তবু দুটি খেয়ে বেঁচে আছি। একটা জীবিকাই বলতে পারেন। আমি জানি, আপনি কাউকে বলবেন না। চলি। আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

বলে সে মোড়ের আলোয় বিশাল ছায়া ফেলে দ্রুত চলে গেল। আমি ভূতগ্রস্তের মতো বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাগল অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু আমি কি সত্যি ব্যাপারটা দেখলাম? কথাগুলো শুনলাম? বিশ্বাস করতে পারছি না।

হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপটায় আমি শীতে কেঁপে উঠলাম। আর আমার কানে বেজে উঠলো, 'আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

তার পরেও আজ পর্যন্ত সেই পাগলকে দেখি। তার উন্মাদ চোখের দৃষ্টিতে আমাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ কখনো দেখি না, অথচ তার সেই কথাগুলো আমি কখনো ভুলতে পারি না, 'একটা জীবিকাই বলতে পারেন।...'

আমি আজকাল আর তাকে ভয় পাই না। আমি তার কথা কখনো কারোকে বলি নি। আমার মনে বহু জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও তাকে আমি যেচে কখনো কিছু জিজ্ঞাসাও করি নি। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষ—হ্যাঁ, মানুষ যে কতো ভাবে বাঁচে!

কলম্বাস বা কুকের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে, অতএব সেদিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাটা অনেকখানি খেটে যায়। অবিশ্যিই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে তুলনা আদৌ করতে চাই না। সম্রাট হবার কোনো বাসনা আমার নেই।

যোগ্যতা থাকলে তো বাসনার প্রশ্ন ওঠে। বরং দীন কাঙাল হরিনাথের মতো কিছু গান গেয়ে যেতে পারলেই সার্থক মনে করবো।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, অপরদিকে সাহিত্য-সম্রাট। আমি ওসবের ধারেকাছে নেই। কিন্তু আমার একটি জিজ্ঞাসা মনকে খুবই উতলা করে। তিনি কি সত্যি কপালকুণ্ডলা নাম্নী কোন তরুণীকে বনমধ্যে দেখেছিলেন? না কি কপালকুণ্ডলা একান্তই তাঁর কল্পনার প্রতিমা?

কাঁথি শহরের এক প্রান্তে আমি কপালকুণ্ডলার মন্দির এবং প্রতিমা দর্শন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে কাঁথি বা ইংরেজী উচ্চারণের কন্টাই শহরটি ছিল, নিশ্চয়ই তা অনেক ছোট ছিল। সেই হিসাবে তৎকালীন কাঁথি মহকুমা শহর থেকে কপালকুণ্ডলার মন্দির নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূরে গ্রামে ছিল। সেখানকার গ্রামীন পরিবেশটা এখনো যায় নি, যদিও নতুন শহর সেইদিকেও ছড়িয়েছে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, শ্বেত পাথরের ফলকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতির কথা লিখিত আছে।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। আমি প্রত্নতত্ত্বের লোক নই, অনুসন্ধানীও বলা চলে না। কিন্তু একটা শুধু জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গিয়েছে। আমি প্রথম যখন কপালকুণ্ডলার মন্দিরে

গিয়েছিলাম, তখন প্রতিমার রূপ দেখেছিলাম একরকম। সেই মূর্তি ছিল রক্তস্তনী। পাশেই কয়েকটি খড়্গ ঝোলানো ছিল, পুরনো আর জীর্ণ, ধারগুলো মরচে পড়া। মন্দিরের পূজারীর মুখে শুনেছিলাম, ওখানে যে পশুবলি হয় খড়্গগুলো তারই।

কপালকুণ্ডলা মন্দিরের পূজারীর একটি প্রথা, যে খড়্গ দিয়ে বলি হয়, তার রক্ত কখনো খড়্গের গা থেকে জল দিয়ে ধোয়া হতো না। রক্ত খড়্গের গায়েই লেগে থাকার দরুণ একটি খড়্গ দিয়ে বেশি দিন বলির কাজ চালানো যেতো না। সেইজন্যই অনেক খড়্গ জমে যেতো।

মন্দিরের পিছনে একটি বড় জলাশয় আছে। আশেপাশে বেশ কিছু জমিও। সেখানে শবদাহ করা হয়, তার চিহ্নসকলও আছে। বক্রেশ্বর বা তারাপীঠের মতো মহাশ্মশানের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কয়েক বছর পরে আবার যখন যাই, দেখলাম কপালকুণ্ডলা আর রক্তস্তনী নেই, মাটির প্রতিমাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খড়্গগুলো নেই, ইতিমধ্যে পূজারী পুরোহিতেরও পরিবর্তন হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে সে আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এই মূর্তিই ছিল, যা আদৌ সত্যি না। খড়্গগুলো যে কোনকালে ছিল, তা-ই সে বলতে পারলো না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই আমাকে ফিরতে হয়েছিল।

যাই হোক, সংবাদপত্রের চিঠির মতো আমি কোন বক্তব্য এখানে তুলতে বসি নি। কপালকুণ্ডলা এবং তার মন্দির, এবং বঙ্কিমচন্দ্রই আপাততঃ আমার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের বিষয়। আমি জিজ্ঞাসু মনে ভাবি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন (নিশ্চয়ই ঘোড়ার পিঠে চেপে!) তখন কি এর চারপাশে গভীর বন ছিল? সমুদ্র কি ছিল খুবই নিকটে, যার উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার গর্জন শোনা যেতো?

আশ্চর্যের কিছুই না। স্থানীয় মৃত্তিকায় আমি বালির স্তর

দেখেছি। আশেপাশে যে সব গাছপালা রয়েছে, নারকেল গাছসহ সবই প্রায় সামুদ্রিক অঞ্চলের। কাঁথি থেকে সমুদ্র যে এখন খুব বেশি দূর সরে গিয়েছে তাও নয়। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কপালকুণ্ডলার মন্দিরের বাস্তবতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েছিলেন, এবং কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার কল্পনা, সেই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ধ্যানে ঝিলিক হেনেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী দেখে? কপালকুণ্ডলার মতো তরুণী কি তাঁর চোখে পড়েছিল? কাপালিকের মতো কোনো তান্ত্রিক যোগীকে তিনি কপালকুণ্ডলা মন্দিরে বা তার আশেপাশের বনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন? নাকি সে-সবই তাঁর কল্পনা, প্রতিভার দ্বারা রচিত? এসব প্রশ্ন আমার মনকে চঞ্চল করেছিল। মনে হয়, এর জন্য বর্তমান কালের একজন সাহিত্যিক হওয়ার প্রয়োজন হয় না, যে-কোনো মানুষের মনকেই এসব জিজ্ঞাসা কৌতূহলিত ও চঞ্চল করতে পারে।

এসবই হলো, আমার নিজের কপালকুণ্ডলার ভূমিকা। কপালকুণ্ডলা, উনিশশো আটষট্টি। কথাটা এভাবেই আমাকে বলতে হয়। উনিশশো আটষট্টি থেকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, ঘটনাটা সেই সালের।

আমরা কয়েকজন বন্ধু সেই সালের শীতের সময় একটি বড় নৌকায় সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যাত্রা করেছিলাম মোল্লাখালি থেকে। খুব বিশদ বর্ণনায় আমি যাবো না, কারণ আপাততঃ আমি কোনো ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসি নি। কলকাতা থেকে বিশেষ যোগাযোগে আগে থেকেই আমাদের একটি বড় নৌকার ব্যবস্থা করা ছিল। এক্ষেত্রে লঞ্চে যাবার আমি ছিলাম ঘোরতর বিরোধী। লঞ্চের মোটরের যান্ত্রিক শব্দটাই আমার কাছে বিরক্তিকর। সমুদ্র নদী আর বনকে চকিত চমকে জাগিয়ে দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার পক্ষপাতী আমি মোটেই ছিলাম না।

নৌকাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বড় না বলে সেটাকে বিরাট আখ্যা দেওয়া ভালো। আমাদের শোবার বিছানা পাতার ভালো পরিসর ছিল। রান্নার জায়গাও অনেকখানি। মস্ত বড় বড় দুটো জলের জালা উঠেছিল। কেননা নোনা জলের অকূলে ভাসতে হলে, মিষ্টি পানীয় জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট রাখতেই হয়। দশ দিনের খাদ্য তুলে নিয়েছিলাম। প্রধানতঃ চাল ডাল নুন লঙ্কা তেল ইত্যাদি। চিড়ে-মুড়ি যতোটা সম্ভব আনাজপাতি আর মিষ্টি। প্রধান মাঝিটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। শক্ত স্বাস্থ্যবান অভিজ্ঞ, কিন্তু অল্প বয়সের পুরুষ। মাথায় বড় বড় চুল। সে ভক্ত মানুষ, ভালো গান জানে। সে ছাড়া আরো দুজন যুবক শক্তিশালী মাঝিও তার সঙ্গী ছিল। প্রধান মাঝির নাম সত্য সাঁই।

দয়া করে এর থেকে কেউ ধরে নেবেন না, সাঁইবাবা নামক সাধক সিদ্ধপুরুষের বিষয়ে কিছু বলছি। মাঝি তার এই নামটিই বলেছিল। সে একদা সাঁইদার ছিল। তারও আগে ছিল মৌলি —অর্থাৎ যারা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের বাঘকে সে নিতান্ত বাঘ মনে করে না, দেবতা মনে করে এবং তাকে বশ করার মন্ত্রতন্ত্রও তার জানা আছে। বাঘ ভূত ডাকাত সুন্দরবনের জলে ডাঙায় এই ত্রিবিধ জীবদেরই একমাত্র ভয়। এসব নিতান্ত ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্য সাঁইদের আন্তরিক বিশ্বাস। ভূত যতোই অবায়বীয় হোক, অতি বাস্তব সত্য। সত্য সাঁই সে-সব ভূতদের বন্ধন আর মুক্তির মন্ত্রও জানে। এসবই হচ্ছে একজন খাঁটি সাঁইদারের লক্ষণ। কারণ সে নেতা। মাঝিদের জীবনের দায়-দায়িত্ব সবই তার। সুন্দরবনের গভীরে সর্পিল খাড়ি এবং অকূলে সর্বত্রই মাঝিদের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মাঝিরা নিশি পাওয়া আচ্ছন্নের মতোই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসে না।

সাঁইদারের কাজ সেই সব অদৃশ্য দুরাত্মাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা এবং তাকে বিতাড়িত করা, অথবা তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেওয়া।

বনবিবি প্রধানতঃ ব্যাধির দেবী। অসুখের মধ্যে আমাশয়, কলেরা, আর ঘা-পাঁচড়া। বনবিবির পূজা এক্ষেত্রে অতি আবশ্যিক। আর দক্ষিণরায় হলেন ব্যাঘ্রদেবতা। অর্থাৎ দক্ষিণের রাজা।

সত্য সাঁইয়ের গল্পের ভাণ্ডার এতোই ঐশ্বর্যপূর্ণ, আমি তার কাছে একান্ত গরীব। ধরে নিতে হবে, এই যাত্রায়, সে-ই আমাদের রক্ষক এবং নেতা। আমরা তা সর্বাংশে মেনেও নিয়েছিলাম।

এবার কপালকুণ্ডলার কথায় আসা যাক।

যাত্রা করবার তৃতীয় দিনে সাত জেলিয়াতে আমরা স্নান করবার সুযোগ নিয়েছিলাম। সাত জেলিয়ার হাটের ধারেই টিউবওয়েল ছিল। শীতের দিন হলেও আমাদের প্রতিটি রোমকূপ একটু মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। মলমূত্র ত্যাগের জন্য আমাদের সব সময়ই বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিতে হতো। বিপজ্জনক এই কারণে, আমরা মাঝিদের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

নৌকার ধার থেকে একটি দড়ি আর বাঁশের ঝোলানো মই নেমে গিয়েছে জলের গায়ে। সেই মই বেয়ে নিচে নেমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা। বিপজ্জনক বলার কারণ এই না যে সাঁতার না-জানা। সাঁতার আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সুন্দরবনের নদী নালায় কেউ নামে না, স্নান তো দূরের কথা। জলে নেমে জল শৌচের কথাও কেউ ভাবে না। সেটা যে কেবল জল লবনাক্ত বলেই তা না। কুমীর কামটের ভয়। কুমীরের থেকেও স্থানীয় লোকের ভয় কামটকে। কামট হাঙর শ্রেণীর এক জাতীয় হিংস্র জলজন্তু। হাঙরের মতোই অতি তীক্ষ্ণ দুই পাটি দাঁত। আকারেও কম বেশী সেই রকম। রঙটা কালো-সবুজ শ্যাওলার মতো, মুখ অনেকটা শূকরের মতো ছুঁচলো। অতি ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামী এবং সজাগ জলচর প্রাণী। মানুষবাহী নৌকোর এবং মনুষ্যবসতি ডাঙার কাছেপিঠেই তারা ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলেই ধারালো দাঁতে নিমেষে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। কুমীর তবু চিবিয়ে

খায়, কামট যান্ত্রিক ধারালো করাতের মতো চোখের পলকে শরীর টুকরো টুকরো করে দেয়।

অতঃপরও যে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলো সারতে পেরেছি। সেটা ভাগ্য বলতে হবে। নোনাজলে স্নান করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারা গা যে কেবল চটচট করে তাই না, শুকিয়ে যাবার পরে চুলকাতে আরম্ভ করে। সুন্দনবনের মাঝিদের একটা বড় চর্মরোগই হলো দাদ। হাজার কথা তো বাদই দিলাম।

সাত জেলিয়াতে আমরা কেবল স্নান করলাম না। জালার জল যতোখানি ব্যয় হয়েছিল তা আবার পূর্ণ করে নিলাম। গোটা কয়েক মুরগীও কেনা গেল। সত্যি বলতে কি, মুরগী কেনার কোনো দরকারই আমাদের ছিল না। নিতান্ত মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যই কেনা হয়েছিল। মাছ আমরা প্রচুর পেতাম। ভোরবেলা যে কোন নদীর বুকেই জেলে-মাঝিরা যখন জাল তুলতো, প্রথম সূর্যালোকে জালে আটক পড়া নীলকান্তমণি রঙের ভেটকির গায়ে যেন সাত রঙ খেলে যেতো। অথবা রূপালি আভাস। অতি তৈলাক্ত স্বাদু মাছ। দামেও পেতাম অনেক কম।

সাত জেলিয়ার পরে পঞ্চম দিন রাত্রে আমাদের কুমীরখালি পৌঁছুবার কথা। এবং সেখানেই রাত্রিবাস হবে, এরকম ঠিক ছিল। কিন্তু সত্য সাঁইয়ের মতো মাঝিও রাতের অন্ধকারে ঘোষণা করলো, পথ ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। আমরা কম্বল আর লেপ মুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভিতরে হ্যারিকেনের আলোয় তাস খেলছিলাম।

তখন ভাঁটা চলছিল। পথ ভুলের কথা শুনে বাইরে গেলাম দুটো দাঁড় পড়ছিল ঝপ্ ঝপ্ করে আর অন্ধকারে দাঁড়ের আঘাতে জলের মধ্যে ফসফরাসের জন্য অজস্র জোনাকির মতো জল ছিটকে উঠছিল। দিগন্তব্যাপী আর কিছুই দেখা যায়

না। তারাভরা আকাশ আর দিগন্তবিস্তৃত জল মেশামেশি করে আছে।

সত্য সাঁইকে কেমন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে উৎকর্ণ হয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলো। আমরা ভয় পেলাম, বোধ হয় নৌকা সমুদ্রের অকূলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, 'সমুদ্র না, ডাকাত। আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

তারপরেই সাঁইদারের নির্দেশ, হ্যারিকেন নিভিয়ে দিন। কেউ বিড়ি-সিগারেট খাবেন না। একটি আলোর বিন্দুও যেন দেখা না যায়। কথাবার্তা একদম বন্ধ। একটি কথাও যেন কেউ উচ্চারণ না করি। এবং মাঝিরা ছাড়া আমরা সকলেই যেন ছইয়ের ভিতরে থাকি। এই নির্দেশের পরে ছইয়ের মধ্যে আমরা কেবল নিজেদের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে লাগলাম। সে শব্দ দাড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দের থেকেও যেন প্রচণ্ড হয়ে বাজছিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এইরকম রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার পরে সত্য সাঁইয়ের স্বরে বিপদমুক্তির সাইরেন শুনতে পেলাম, 'বাবুরা, বাতি জ্বালেন, এবারে খেয়ে নেয়া যাক। খারাপ জায়গাটা পেরুইয়ে এসেছি।'

ভোরবেলার ঝাপসা কুয়াসায় আবিষ্কার করা গেল, আমরা পাখীরালা রণবিভাগের অফিসের ঘাটের নিচে রয়েছি। আমার এক বন্ধু বোধ হয় রাত্রের উদ্বেগের ধকল সহ্য করতে পারছিল না। সে মুখে জল না দিয়েই হুইস্কির বোতল তুলে নিট্ চুমুক দিল।

তারপরে আমরা যখন বড় বড় মোটা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে বনবিভাগের অফিসের মাটিতে পা দিলাম, তখনই একটা ঘরের ভিতর থেকে রীতিমতো ধমকানো আর উদ্বিগ্ন চিৎকার শুনতে পেলাম, 'আরে মশাই, কে আপনারা? কোন্ সাহসে এখানে উঠে এসেছেন? তিন দিন ধরে একটা বাঘ অফিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীগ্‌গির পালান।'

আমরা নিরস্ত্র বন্ধুরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সেই পলিপড়া পিছিল কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। একজন আছাড়ও খেলো। কিন্তু আমরা প্রাণে বাঁচলাম।

আমার এসব বিষয়কেও বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতক অতিক্রান্ত কপালকুণ্ডলার ভূমিকাই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে আমাদের মতো বিপত্তি ভোগ করতে হয় নি। কামট কুমীর ভূত বাঘ ইত্যাদির কথা কপালকুণ্ডলা পড়তে গেলে মনেই আসে না। বরং আরণ্যক ভয়াবহতার মধ্যে কেমন একটা রোমান্টিক ভাবই জেগে ওঠে। তারপরে যখন শুনতে পাই, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' তখন তো মনে হয়, নবকুমারের পরিবর্তে আমিই কেন সেখানে উপস্থিত হতে পারলাম না! রমণীর স্বরে সেই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র, সুন্দরবনের ভয়াবহতার কথা আর একটুও মনে থাকে না। সুন্দরবন হয়ে ওঠে এক রহস্যময় নন্দনকানন।

এখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোরবেলাই পাখিরালার স্যাংচুয়ারির মাচায় আমরা চুরি করে উঠেছিলাম। আমাদের কোনো অনুমতি ছিল না এবং বিনানুমতিতে অভয়ারণ্যের খালে যাওয়া বা মাচায় ওঠার অধিকার আমাদের ছিল না।

কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, শিকার আমাদের লক্ষ্যও ছিল না, লাভের মধ্যে একটু পাখী দেখা। এই চৌর্যবৃত্তিটুকু আমরা না করে পারি নি। এমন কি বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে আমরা কুমীরখালির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেলা বারোটার সময় যখন রান্নাবান্না প্রায় শেষ, আমরা আবার স্নানের জন্য উন্মুখ হলাম। কিন্তু মিষ্টি জল পাবার কোন উপায় নেই। আমরা কোমরে সংক্ষিপ্ত বাস জড়িয়ে খালি গায়ে মাচার রোদে বসেছিলাম।

এমন সময় আমাদের চোখে পড়লো একখণ্ড জমি। একটি

ছোট্ট দ্বীপ, যেন জলে ভেসে রয়েছে। বড় গাছপালা চোখে না পড়লেও জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপটিকে সবুজ দেখাচ্ছিল। আমাদের সকলের দৃষ্টিই দ্বীপটি আকর্ষণ করলো। দ্বীপটির পঁচিশ-তিরিশ হাত দূর দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম, 'মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে স্নান করতে আমাদের অনেক দেরি হবে। আমরা এই দ্বীপে নেমে গায়ে তেল মাখতে পারি, তারপরে খানিকটা রোদ খেয়ে নোনা জলেই স্নানটা সেরে নেওয়া যেতে পারে। গায়ে যা জ্বালা ধরেছে, একটু স্নান না করলে আর চলবে না।'

আমাদের মধ্যে যে সাঁতার জানে না সে বললো, 'নোনা জলেই না হয় চান করবো, কিন্তু জলে নামবো কী করে? এখানে কুমীর না থাক, কামট কি নেই?'

কামটের কথা আমার মনেই ছিল না। আর এক বন্ধু বললো, 'তা ছাড়া এ দ্বীপে আমাদের নামা উচিত হবে কী না, সেটাও জানা দরকার।'

নিঃসন্দেহে। সত্য সাঁইয়ের অনুমতি না পেলে আমরা দ্বীপে নামতে পাবি না। তবে দ্বীপটি সবুজ দেখে আমার মনে হলো, ভরা বর্ষায়ও হয়তো দ্বীপটি পুরোপুরি জলে ডোবে না। অন্যথায় সবুজ হাঁটুসমান জঙ্গলে ভরে উঠতো না। আমি সত্য সাঁইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি ওই ডাঙ্গায় নেমে একটু তেল মেখে চান করতে পারি?'

সত্য সাঁই দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বললো, 'তা পারেন। ভয় হলে নামতি পারবেন না। একটা বালটিতে দড়ি বেঁধে দিতেছি, জল তুলি তুলি মাথায় ঢালতে পারবেন।'

বলেই সে হালে মোচড় দিয়ে মুখ ঘোরালো। তার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা জোয়ারের জলে ডুবে যায় না?'

সত্য সাঁই বললো, 'ইদানী বছর-দুই ধরি দেখতিছি ডাঙ্গাটা

জাগতিছে। মনে হয় কি, আর দু-এক বছর বাদে এটা আরো বড় হবি, ত্যাখন আবাদ হতি পারবে।'

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, দ্বীপটির একটা অংশ খানিকটা উঁচু টিপির মতো উঠে গিয়েছে। সেদিকটায় এক শ্রেণীর গাঢ় সবুজ লতানে ঝোপঝাড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। সত্য সাঁইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ডাঙ্গায় বাঘ বা কুমীর নেই তো?'

সত্য সাঁই হেসে বললো, 'আইজ্ঞে না। ওঁয়ারা (বাঘ কুমীর) এখেনে কী করতি থাকবেন বলেন? খাবেনটা কী? জঙ্গল বাড়লি পরে জানোয়ার-টানোয়ার থাকলি ওঁয়ারা থাকতেন। সোম্‌সারের জীব যেখেনে খাতি পায়, সেখেনে যায়। তয় মেছো কুমীর এক আধটা থাকলি থাকিতিও পারে। একটু দেখে শুনি চলবেন।'

আবার মেছো কুমীর কেন? মনে একটু ভয়-ভয় ভাব থেকে গেল। কিন্তু ডাঙ্গায় নামতে পারার আনন্দে সে ভয় বেশিক্ষণ টিকলো না। মাটির ওপরে রোদে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কতো দিন তেল মাখি নি! শত হলেও ডাঙ্গার জীব আমরা। দু-এক দিন জলে থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ আমাদের সপ্তম দিন।

নৌকা দ্বীপের ভূমি স্পর্শ করলো। এক জোয়ান দাঁড়ি দড়ি ধরে লাফিয়ে নামলো, আর একজন লোহার ভারি নোঙর ছুঁড়ে ফেলে নিজেও লাফিয়ে নামলো। তারপরে নোঙর গাঁথলো। আমরা তেলের শিশি, সিগারেটের প্যাকেট, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে আণ্ডারওয়্যার পরে নামলাম। শীতকাল বটে, তবু মাটির ঠাণ্ডা স্পর্শে যেন একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি হলো।

দ্বীপের যে গাছগুলো হাঁটুসমান মনে হয়েছিল, এখন দেখলাম সেগুলো প্রায় কোমরের সমান। দেখতে অনেকটা আঁশশ্যাওড়ার মতো, কিন্তু তা নয়। গাছের পাতাগুলো তার চেয়ে বড়। অনেকটা ডুমুরের মতো, তবে খসখসে নয়, মোলায়েম। এক বন্ধু হুইস্কির বোতল নিয়ে নামতে ভোলে নি। সকলেই আমরা যেন মুক্তির

স্বাদ পেলাম। সিগারেট ধরিয়ে সবাই যে যার ইচ্ছামতো ছড়িয়ে পড়লাম।

অল্প অল্প বাতাস বইছে। গাছের মাথাগুলো হেলে পড়েছে। নীল আকাশ চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। উত্তরদিকে আকাশের গায়ে ঠেকে আছে গাছপালাহীন একটি ভেড়ি বাঁধের রেখা। পূব-দক্ষিণে কোনো গভীর বনের সীমানা জেগে আছে, দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণনীল দ্বীপের মতো। সেই দিকেই কিছু দূরে জলের বুকে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে কয়েক সহস্র বেলেহাঁস। মাঝে মাঝে তাদের অদ্ভুত ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমার কৌতূহলিত দৃষ্টি উঁচু ঢিবির দিকে। আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। জমিতে 'এখনো বালির ভাগই বেশি। মৃত্তিকার জন্ম হয় নি। যতই এগোতে লাগলাম ততই গাছগুলো যেন পাল্লা দিয়ে বড় হতে হতে আমার বুক আর মাথার সমান হয়ে উঠতে লাগলো। এক ধরণের লতাঝোপও গাছগুলিকে জড়িয়ে উঠছে। আমার ভয় হলো জোঁকের জন্য। জোঁককে আমার বড় ভয়। তবে নোনাজলে জঙ্গলে জোঁকের কথা কখনো শুনি নি। বড় বড় মিষ্টিজলের বাওরে জোঁক থাকে। আর জোঁকের সব থেকে বেশি উৎপাত দেখেছি তরাইয়ে, পাহাড়ে আর আসামের জঙ্গলে, যেখানে নোনার কোনো স্পর্শ নেই।

আমি হঠাৎ থম্‌কিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু হলেই আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আমি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে আমার বাঁদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অভাবিত আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটি মেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখছে। সম্ভবতঃ আমার বন্ধুদেরই সে দেখছে। এবং এমনই নিবিড় অন্যমনস্ক আর কৌতূহল, কিছুটা উদ্বেগেও দেখছে, আমাকে সে দেখতেই পেলো না। টেরও পায় নি, আর একজন মানুষ তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই দ্বীপে মানুষ! তাও একটি মেয়ে? বয়স ষোল-সতরোর বেশি কোনোমতেই না। গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। মুখের এক পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নাক তেমন চোখা নয়, চোখ ভাসা-ভাসা। চোখে রোদ পড়ে ঝক্ঝক করছে। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে, সাদা কয়েকটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। নাকের নিচেই ওপর-ঠোঁটের ওপরে একটি চুটকি নোলক দুলছে। সেটি সোজা বা পিতলের বুঝতে পারছি না। গায়ে কোনো জামা নেই। নীলের ওপরে কালো ডোরাকাটা কালো পাড়েরই একটি সস্তা শাড়ি তার পরনে। পুষ্ট বাহু, উদ্ধত বুক, ক্ষীণকটির নীচেই সুগঠিত কোমর থেকে স্তম্ভের মতো উরুদেশ। দুই হাতে লাল আর নীল কাঁচের চুড়ি।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তদুপরি মানুষ দেখে কেমন যেন ভয় হতে লাগলো। এখানে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। চাষআবাদ নেই, জেলেদের মাছ শুকোবার কারবার নেই। তাহলে দুই চারটি নৌকা অন্ততঃ দেখা যেতো। নৌকায় আসবার সময় অন্য কোনো নৌকাকে নোঙর করে থাকতে দেখি নি।

শহরের মানুষ হিসাবে এবং আধুনিকতার বড়াই থাকা সত্ত্বেও, ভূতের প্রসঙ্গটা আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে বাজতে লাগলো। এ কোনো অশরীর মায়া নয় তো? যাই হোক আমি পালাতে চাই, মেয়েটিকে বা সে যাই হোক, ফাঁকি দিয়ে। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বিশেষ করে সত্য সাঁইকে এ খবরটা দিতে চাই।

ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামান্য নড়তেই মেয়েটি সচকিত বাঘিনীর মতই ঝটিতি আমার দিকে ফিরে তাকালো। ঘাড়ের ঝটকায় তার কপালে চুল এলিয়ে পড়লো। আমি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটির চোখেমুখে প্রথমে অপার বিস্ময় ও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। এবং তারপরেই তার মুখ আর ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি যেন কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু আমি মানুষ। বিস্ময়-চমকের মধ্যেই একটা মুগ্ধতা আমার চোখে ফুটে

উঠলো। মেয়েটির কালো মুখখানি যে এত সুন্দর, এই নির্জন দ্বীপবাসের রুক্ষতাও তা ম্লান করতে পারে নি। তার মুখে একটা তেজোদৃপ্ত ভাব।

আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক পলক দেখেই মেয়েটি পিছন ফিরে দৌড় দিল। আমি কী করবো ভেবে পেলাম না। পালাবো? চিৎকার করে সবাইকে ডাকবো? কিন্তু নিজের আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত হলাম। মেয়েটির পলায়মান পথের দিকেই আমি এগিয়ে চললাম। এক অতি আকর্ষক চুম্বকের টানে আমি যেন নিশি-পাওয়া ঘোরে চলতে লাগলাম। কিছুটা দূরে গাছের পাতা নড়ে উঠতে দেখে সেই দিকে গেলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না।

আমি তখন ঢিবিটার কাছে। আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগলো। প্রথমে মনে হলো শুকনো মাছের গন্ধ। কিন্তু শুকনো মাছের গন্ধ আমার চেনা। এ গন্ধ যেন আরো বিকট আর চামসা। কিসের গন্ধ হতে পারে? মানুষ মরে পড়ে নেই তো কোথাও? একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু পারলাম না।

মানুষ সব সময়ে দৈবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সে নিজেই তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি নিচের দিকে তাকালাম। মানুষের পায়ের ছাপ স্পষ্ট বাঁদিকে গিয়েছে। আমি সেই ছাপ অনুসরণ করে ঢিবিটা প্রদক্ষিণ করতে উত্তরদিকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম গোলপাতার একটি অবিন্যস্ত ছাউনি ঢিবির নিচেই যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট মোটা গাছের গুঁড়ির ওপরে গোলপাতার চাল মাটি স্পর্শ করেছে। ভিতরে প্রবেশের একটি প্রায় সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক। নিশ্চয়ই মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে ঢুকতে হয়।

এটি যদি একটি বাসস্থান হয়, তবে বাইরে থেকে তা দেখবার কোনো উপায় নেই। ঢিবির নিচেই অন্যান্য গাছের সঙ্গে গোল-পাতার চাল মিশে রয়েছে। তারপরেই আমার চোখে পড়লো,

কতকগুলো হাড়গোড় আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্টতই তা মানুষের নয়। কোনো জন্তু-জানোয়ারেরই হবে। গন্ধ এখান থেকেই উত্তরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরেই হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একটি ছোট বাহাড়ি নৌকা। ভেজা হোগলা পাতা দিয়ে ঢাকা।

কী এর অর্থ? নিশ্চয়ই কেউ এই নৌকায় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু কোথায় গেল সেই মেয়েটি? আমি কি কোনো ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়েছি? এই কথা ভাবতেই গোলপাতার ছাউনির সুড়ঙ্গের ফাঁকে সেই মেয়েটির মুখ দেখা গেল। যেন সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা বাঘিনী উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছে। তারপরেই আমার বুক হিম করে দিয়ে একটি লোহার নল আমার দিকে এগিয়ে এলো। বন্দুকের নল। দেশী পাইপগানের নল আমার অচেনা না।

আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে এলো। পেশীবহুল শক্তপোক্ত খালিগা একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায় কাঁচাপাকা রুক্ষু বাবরি চুল, গোঁফদাড়ি ভরা মুখ। গলায় একটি তাবিজ, স্পষ্টই সেটা বাঘের নখের তাবিজ। পরনে একটা লুঙ্গি। হাতে তার একটি পাইপগান। কিন্তু তা আমার দিকে উদ্যত নয়। লোকটির দুই চোখে বাঘের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। মেয়েটি বোধ হয় এসে তার পাশে দাঁড়ালো।

মেয়েটির চোখে-মুখে এখন সেরকম কাঠিন্য নেই। কেবল বিস্ময় আর কৌতূহলে ভরা। দুজনেই আমার আণ্ডারওয়্যার পরা খালিগায়ের আপাদমস্তক দেখলো। তারপরে লোকটিই প্রথম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে বাবা? এখেনে কী করি আলেন?'

আমি যেন একটু ভরসা পেলাম। এ নিতান্ত কাপালিক না, মেয়েটিকেও কপালকুণ্ডলার মতো বন্দিনী মনে হলো না। লোকটির

কথার মধ্যেও কিঞ্চিৎ কোমলতা আর সম্ভ্রমের স্পর্শ আছে। আমি সত্যি কথাই বললাম।

আমার কথা শুনে লোকটির চোখমুখের ভাব একটু নরম হলো। বললো, 'আমার বেটি ছাওয়ালের মুখিও তাই শো'লাম। কলকাতার থেকে আসিছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে নৌকা নিইছেন, মাঝির নাম কী?'

বললাম, 'মোল্লার হাট থেকে। মাঝি সত্য সাঁই।'

লোকটি মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি হাসলো। তার নোলক দুলে উঠে চিকচিক করলো। বেটি ছাওয়াল মানে নিশ্চয়ই কন্যা। এরা তাহলে পিতা-পুত্রী? কিন্তু এখানে কী করে? হাতে এই দেশী পাইপগান বা কেন?

মেয়েটির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই এবার তার মুখে লজ্জার ছটা ফুটলো। লোকটি বললো, 'ময়না, বাবুকে একটা চ্যাটাই পাতি বসতি দে। তামুক খাবেন?'

রীতিমতো আতিথেয়তা। মেয়েটির নাম ময়না? কপালকুণ্ডলা নয়? বললাম, 'আমি তামাক খাই না।'

ময়না একটা হোগলার চাটাই নিয়ে বাইরে আসতেই লোকটি আবার বলে উঠলো, 'থাক, বাইরি বসাত লাগবে না। আপনি ঘরের ভিতর চলেন।'

ঘরের ভিতর? ঐখানেই কি হাড়িকাঠ আছে নাকি? ময়না কিন্তু হেসে উঠে মুখে আঁচল চেপে এই প্রথম কথা বললো, 'বাপ-জানের মাথার ঠিক নাই।'

লোকটি হাসলো। গোঁফদাড়ির মধ্যে তার শক্ত অটুট দাঁতের সারি দেখতে পেলাম। বললো, 'তুই ঘরের মধ্যি বাতি জ্বালা গা।'

ময়না আর একবার আমার দিকে দেখে হেসে হোগলার চাটাই নিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি বললাম, 'ভেতরে যাবার

আর দরকার কী? আমি বরং যাই, আমার বন্ধুরা আমাকে খুঁজবে।'

লোকটি বললো, 'খুঁজলিও আপনারে পাবে না। আসেন।'

স্বর নিরীহ, কিন্তু আমার অমান্য করার সাহস হলো না। আমাকে এগিয়ে দিয়ে সে পিছনে দাঁড়ালো। ভিতরে উঁকি দিয়ে একটা লম্ফর শিস্ দেখতে পেলাম, তার পাশে ময়নার আলুলায়িত কেশ-মুখ। আর কিছুই চোখে পড়লো না। ঢুকতেই ময়না আঙুল দিয়ে হোগলার চাটাই দেখিয়ে বললো, 'ওটোয় বস।'

বসতে গিয়েই বুক কেঁপে উঠল। দেখলাম আমার দু হাত দূরেই একটি প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার অপলক তাকিয়ে আছে। ময়না খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওটা মরা বাঘ। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডুটা জোড়া রয়িছি।'

ধড়ে প্রাণ এলো। এখানেও সেই চামসা গন্ধ। তার সঙ্গে তামাক। আরো নানা কিছুর গন্ধ মেশানো। লোকটি ভিতরে ঢুকে বাঘের মুণ্ডটার সামনেই বসলো। পাশে রাখলো বন্দুক। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম। বাঁশের ফ্রেমের ওপরে গোলপাতা বিছানো। গোলপাতা আসলে খড়ের মতোই লম্বা। কিন্তু খড়ের থেকেও বেশি শক্ত। এক পাশে মাটির হাঁড়িকলসী রয়েছে। পিতলের ঘটি, লোহার কলাই করা দু'একটা থালা দেখতে পেলাম।

লোকটি বললো, 'বাবা, আপনারে একটা কথা কই। আমি ফেরার মানুষ। জঙ্গলপুলিস আমারে খুঁজি ফিরিতেছে। তয় মানুষ খুন করি নাই। বাঘ মেরে আমার নামে হুলিয়া হয়িছি। এখেনে এইসি পালায়ে রয়িছি। এখনও বাঘ মারি, এই বন্দুকে।'

বলে সে বন্দুকটি তুলে দেখালো, দেখিয়ে আবার পাশে রেখে বললে, 'একটা নয়, আরো আছে, নিজের হাতেই বানাই। টোটা কিনতি লাগে। তার জন্যে লোক আছে। আপনি তোরাপ সর্দারের নাম কখনো শুনিছেন?'

তোরাপ সর্দার? নামটা খুবই চেনা লাগলো। কোথাও শুনেছি, না খবরের কাগজে পড়েছি, মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'আমার খুবই শোনা মনে হচ্ছে।' লোকটি বললো, 'আমার নাম তোরাপ সর্দার। এক সমায়ে বাউলি ছিলাম। এই সোন্দরবনে ঘুরাফিরা করতাম। আমার এক ওস্তাদ ছিল, ওনার কাছে বন্দুক বানানো শিখি, বাঘ মারতে আরম্ভ করি। আজতক অনেক মাইরেছি। কিন্তু বাবা, নিজির জন্যে না, আমার পিছনে লোক আছে। তাদের ট্যাকার কাঁড়ি আছে। তারা বাঘ মারতি পারে না, কিন্তু মরা বাঘের ব্যবসা করে। বড় মানুষ আর সাহেবসুবোদের বিক্রি করে মেলাই টাকা রোজগার করে। আমি বাঘ মারি, ওরা মারে আমারে। তারাই এখেনে আমারে লুকোয়ে রেখিছে। হপ্তায় একদিন ওরা আমারে মিঠা পানি আর চাল ডাল দিয়ি যায়। বাইরে একখান লৌকা দেখিছেন?'

বললাম, 'দেখেছি।'

তোরাপ সর্দার বললো, 'ওই লৌকায় করি আমি সুযোগ মতন বাঘ মারতি যাই। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডু রেখি, আর বাঘের চার পায়ের নখ, সব রাখি। হাড় মাংস ফেলি দিই। কিন্তু বাবা, আপনারে বলি, এই বেআইনি কাম আর করতি পারি না, মন চায় না।'

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। জীবনে কখনো এমন একটি লোকের সংস্পর্শে আসবো, এমন এক অজানা দ্বীপে, আর এই কাহিনী শুনবো। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কেন করছেন?'

তোরাপ সর্দার বললো, 'কী উপায় বাবা? যারা আমারে দিয়ি বাঘ মারায়, তাদের গায়ে বিস্তর তেল, জল লাগে না। পুলিশ তাদের কিছু বইলবে না। তারা আমাকে ধরায়ে দিবে। তার উপরে এই বেটি ছাওয়াল আমার, বয়সটা দেখেন। ওরে আমি কোথায় রাখব? এক এক সোমায় ভাবি যে, ওরে একটা গুলি করি মারি, তারপরে নিজির গলায় নল ঢুকয়ে গুলি খেয়ি মরি।'

শেষের দিকে তোরাপ সর্দারের স্বর ভারি শোনালো। আমি ময়নার দিকে তাকালাম। সে নত মুখে লম্ফর কাছে বসে আছে। খোলা দীর্ঘ রুক্ষু চুলের রাশি তার মুখের দু-পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। আমি তার ভুরু, নাকের ডগা, নোলক ঠোঁট চিবুক দেখতে পাচ্ছি। সে হঠাৎ তোরাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বাপজান, তুমি তা কোনদিন পারবে না। বন্দুক চালাতি আমি শিখিছি। একদিন আমিই নিজ্জিরি মারি ফ্যালাবো।'

তোরাপের গোঁফদাড়িতে বিষণ্ণ হাসি, বললো, 'অই শোনেন বাবা।'

ময়না ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বাবার দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়ে বললো, 'এতে আবার শুনবের কী আছে? তা না হলি আমারে কও, বন্দুক নিয়ি গোসাবায় যেয়ি তোমার কত্তা বাবুদের খুন করি আসি।'

কৃষ্ণাঙ্গী ময়না কোনো মনস্তাত্ত্বিকের সৃষ্টি জটিল চরিত্রের কপালকুণ্ডলা না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই রক্তস্তনী শক্তি দেবী কপালকুণ্ডলার মূর্তি। যে কাপালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় না। নিজের হাতে খড়্গ ধারণ করতে চায়। আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দেখলাম। ময়নার চক্ষে আগুন, নাসারন্ধ্র স্ফীত। উদ্ধত বুক দ্রুত নিঃশ্বাসে ঢেউয়ের মতো ওঠা নামা করছে। নীলের ওপর কালো ডোরায় তাকে অন্য এক রূপ দান করেছে।

তোরাপ গম্ভীর মুখে বললো, 'বাঘ মারার জন্যি যদি জেলে যেতি হয়, তা বাবুদের খুন করি যাওয়া ভাল। কিন্তু বেটি, মানুষ তো কখনো মারি নাই।'

ময়না বললো, 'আমি মারব।' বলে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'আমি বাপজানরে বলি, তুমি আর বাঘ মারতি যেইও না। পুলুশকে বুঝয়ে বললি কি তারা শুনবি না?'

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। ময়না আমাকে কথা-গুলো বলে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

লম্ফর.আলো ওর গায়ে কাঁপছে। অস্বীকার করবো না, আমি এক বিশেষ আবেগের স্রোতে ভেসে চলেছি। মনে হলো, এই পলাতক তোরাপ সর্দারের ঘরে তার মতো করেই তার ঘরে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আমার এই আবেগ আচ্ছন্নতার মধ্যেই বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল। তারা আমার নাম ধরে ডাকছে।

সত্য সাঁইয়ের স্বরও আমি চিনি। সেও 'বাবু বাবু' বলে চিৎকার করছে।

তোরাপ সচকিত হয়ে বাইরের দিকে মাথা নিচু করে তাকালো। বললো, 'বাবা, সত্য সাঁই আমারে চিনে। সে যদি জানতি পারে আমি এখেনে আছি, আর আমার উপায় নাই। ধম্মের নাম করি বলি যান, ওদের কিছু বলবেন না।'

সেই ধর্ম যদি মানুষের ধর্ম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বলবো না। কিন্তু এ কি ভয়াবহ অবাস্তব জীবনযাত্রা? এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? আমি আবার ময়নার দিকে তাকালাম।

তোরাপ কী ভেবে বলে উঠলো, 'বাবা, আমার এই বেটিও আজতক তিনটা বাঘ মারিছে। ওরে যদি একটা শাদী দিতে পারতাম! তা সে যাক বাবা, আমার কথাটা রাখবেন।'

আমি বললাম, 'মানুষের ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, সত্য সাঁইদের আমি আপনার কথা বলবো না। কিন্তু আপনি এ মেয়েকে নিয়ে এভাবে এখানে আর কতোদিন থাকবেন?'

তোরাপ বললো, 'সেটা বাবা খোদায় বলতি পারে, আর দক্ষিণ রায়।'

একটা কথা সহসা মনে এলো। বললাম, 'আপনি তো মুসলমান। আপনি যশোর বা খুলনায় পালিয়ে যান না কেন! সেটা তো ভিন্ন দেশ। এ দেশের পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না।'

ময়না ক্রূর চোখে আমার দিকে তাকালো। তোরাপ বললো,

'সে কথা যে ভাবি নাই, তা না। কিন্তু বাবা, সে দেশের পুলুশ কি আমারে ছেড়ি দেবে? আমার কাগজ-পত্তর নাই।'

বাইরে বন্ধুদের আর সত্য সাঁইয়ের চিৎকার ক্রমে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, 'আপনার কোন শাস্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনি সব সত্যি কথা বলবেন। দেখুন আপনি জানেন একটা কথা আছে, যুদ্ধে ছল বল কৌশল সবই দরকার হয়। পাশের দেশ ইসলামের দেশ, মুসলমান হলে মাপ। আপনি চলে যান। এ ছাড়া আপনার আর কোনো বাঁচার রাস্তা ছিল না। তবু যদি বলবার আপত্তি না থাকে আপনার সেই বাঘের ব্যবসায়ী বাবুদের নামগুলো আমাকে বলতে পারেন।'

তোরাপ সর্দার দ্বিধা করলো, কন্যার দিকে তাকালো। ময়না বলে উঠলো, 'বল, কেন বলবা না! আমিই বলতিছি, একজন যোগেন দয়াল, আর একজন ভূষণ চৌধুরী। তাদের ধান চাল মধুর মস্ত ব্যবসা আছে।'

তোরাপ বললো, 'বাবা আপনি ওঠেন।'

আমি হামাগুড়ি দিয়ে চালার বাইরে এলাম। আমার পিছনে ময়না আর তোরাপ সর্দার। তোরাপ নিচু স্বরে বললো, 'তয় বাবু, আপনার কথা মতন পাকিস্তানের কথাটাই আমার মনে ধরতিছে। গেলি পরে খুঁল্‌নেতেই যাবগা।'

চিৎকার ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই ময়না আমার হাত চেপে ধরলো, টেনে নিয়ে গেল বিপরীত দিকে, এবং রীতিমতো ছুটতে লাগলো। আমার পতনের ভয় প্রতি মুহূর্তে। বেশ খানিকটা ছোটার পরে ময়না থেমে ফিসফিস করে বললো, 'এখেন থেকে জবাব কর। বল তুমি এখেনে।'

আমি মুহূর্তেই ময়নার মনোগত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। আমার বন্ধুরা পাছে তোরাপদের গোপন ডেরায় যাতে চলে না যায়,

তাদের বিপথগামী করাই ময়নার উদ্দেশ্য। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি এখানে।'

ময়না আবার আমার হাত ধরে খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে বললো, 'আবার হেঁকি বল।'

আমি কয়েকবার চিৎকার করলাম। তার উত্তরে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল, 'শালা বেঁচে আছিস? দাঁড়া যাচ্ছি।'

ময়না ফিক্ করে হেসে উঠলো। আমি তার হাতের দিকে তাকালাম, যে-হাত দিয়ে সে আমার হাত ধরে রেখেছিল। আমি তাকাতেই ও আমার হাতটা ছেড়ে দিল। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখে লজ্জা ফুটলো। এই শীতেও তার কপালে চিবুকে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অবিন্যস্ত চুলে তাকে এলোকেশীর মত দেখাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ মুগ্ধতা এমন কি রক্তেও সঞ্চারিত হচ্ছে। আমি আমার নাগরিক মনটাকে কথঞ্চিৎ চিনি। কিন্তু এই দুর্জয় কপালকুণ্ডলার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কেবল বলতে পারলাম, 'ময়না, চলি।'

ময়না কোনো জবাব দিল না, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তারপর নিজেই পিছন ফিরে চলতে লাগলো।

কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো। ওর হাসিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটু আবেগও কি চোখের তারায় সঞ্চারিত? ও আবার ঘাড় কাত করে বললো, 'এইস গা।'

বলেই গাছলতাগুল্মের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্য সাঁইকে আমি নৌকায় কিছুই বলি নি। মোল্লাহাটে ফিরে গিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে তোরাপ সর্দারকে চেনে কী না। সত্য সাঁই জবাব দিয়েছিল, 'আরে বাপ্‌রে বাপ! তোরাপ সর্দার তো বাবু আর এক দক্ষিণ রায়। তারে পুলিশ খুঁজি বেড়াতিছি। বাঘেরাও খুঁজি ফিরতিছি। সে মন্তর দিয়ি বাঘেরে

ঘুম পাড়াতি পারে। আর তার এক মেয়ে আছে। শুনি বাপ বেটিতে এই সোন্দরবনে বাঘের সঙ্গেই থাকে।'......

এই ঘটনার ছ'মাস পরে, খবরের কাগজে একটি ছোট সংবাদ বেরোয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সংবাদদাতা জানায়, 'বাঘের যম তোরাপ সর্দার নিখোঁজ। অনেকেরই সন্দেহ, সে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গিয়েছে। সরকারী হিসাবে এ পর্যন্ত সে প্রায় পনেরোটি বাঘ হত্যা করেছে।.....

সংবাদটা আমাকে দ্বিধান্বিত ও বিচলিত করে। তোরাপ কি সকন্যা বাঘের পেটে গিয়েছে, অথবা সীমান্তের ওপারে পালিয়েছে? বাঘের পেটে গেলে সম্ভবতঃ কোনো না কোনো ভাবে জানা যেতো।

বাংলাদেশে বিপ্লবের পর সেই দেশে গিয়াছিলাম। তোরাপের খুলনেয় (খুলনায়) নানা জায়গায় খোঁজখবর করেছি। তোরাপ সর্দারের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। অতএব ময়নারও না।

ময়না না, আমার কাছে সে কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের দুর্জয় মোহ আর স্তব্ধ হৃদয়ের কথা শোনবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা কোনটাই আমার নেই।

সেই দিক থেকে আমার ট্র্যাজেডির রূপটা আলাদা।

সাধ

নমিতার স্বরে কান্না থমকানো, কিন্তু ঝাপটার মতো ধিক্কার আর ঘৃণায় ফুঁসে উঠে বলে, 'ও মেয়ের মুখ দেখতে চাই না, ও মেয়ে মরুক।'

গোপীনাথ নমিতার পাশে শোয়া। ঘর অন্ধকার। মাথার টালির ওপরে টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ। কাছের জলা থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসে। সঙ্গে ঝিঁঝিঁর ঝংকার। টালির মাথায় খুটখাট শব্দ, বোধ হয় ইঁদুর ছুটোছুটি করে। গোপীনাথ নির্ভুলভাবে অন্ধকারে নমিতার বুকে একটি হাত রাখে। নমিতার বুকে আঁচল সরানো,

গায়ে জামা নেই। গোপীনাথের হাত পড়ে নমিতার বুকের মাঝখানে, জেগে ওঠা হাড়ের ওপরে। অতি স্পষ্ট না, তবু হাড় টের পাওয়া যায়। পার্শ্বে আর নিচের দিকের নাভিতে শিথিল বুক, স্বাভাবিক গরম। গোপীনাথ নমিতার বুকের স্পন্দন টের পায়, কিন্তু স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে ওঠানামা করে না। গোপীনাথ বোঝে, নমিতা বুকে কান্না আটকে রেখেছে। সে বললো, 'কেঁদো না।'

'কাঁদবো? আমার মরণ নেই, ও মেয়ের জন্য আমি কাঁদবো?' নমিতার মরণই হলো, একথা বলতে গিয়েই রুদ্ধ কান্না স্বরে স্ফুরিত হলো, 'আগে জানলে এই মেয়ে আমি পেটে ধরি?' যেন দুরন্ত যন্ত্রণা আর অনুশোচনায় তার স্বর ডুবে যায়।

এ কান্না বিগলিত না, প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসে ধরে রাখবার চেষ্টা। গোপীনাথ টের পায়। সে জানতো, সারা দিনের মতো রাগ-ঝামটা এইভাবে ফেটে পড়বার অপেক্ষায় ছিল। সে জানতো, নমিতা আর কেবলমাত্র রাগের দ্বারা দুঃখ আর যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে পারছে না। গোপীনাথ বউয়ের বুকে হাত চেপে চেপে বুলিয়ে দিতে লাগলো। কান্না থামাতে চাইছে না, সান্ত্বনা দিতে চাইছে। কিন্তু বলার কিছু নেই। সে বুক থেকে হাত তুলে নির্ভুলভাবে একবার নমিতার চোখের কোলে ছোঁয়ালো। ভেজা, গরম জলের ধারা। নমিতা হাত দিয়ে গোপীনাথের হাত সরিয়ে দিল।

গোপীনাথ জানে, নমিতার এ স্নেহ সান্ত্বনা সহে না। তার চেয়ে ওর দুঃখ আর যন্ত্রণা গভীর। কারণ দুঃখের থেকে বড় যে অপমান প্রাণে লাগে তা অতি নিষ্ঠুর। গোপীনাথ উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপে। তার আর একটি হাত, পাশেই অঘোর ঘুমে শায়িত মেয়ের গায়ে। মেয়ের বয়স চার পেরিয়ে পাঁচ। দু বছরের ছেলেটি নমিতার বাঁ দিকে ঘুমাচ্ছে। মেয়ে গোপীনাথের ডান দিকে। নমিতা এই মেয়ের কথাই বলে। নরম কৃশ ছোটখাটো একটি প্রাণী। পরম নিশ্চিন্তে বাবার গা ঘেঁষে কাত হয়ে গুটিসুটি ঘুমোচ্ছে। বাবার অন্য পাশে শুয়ে মা ওর মৃত্যুকামনা করছে, ও কিছুই শুনতে পারে না,

জানতে পারে না। সংসারের যেটুকু যা কিছু বোঝে বা জানে, এখনো কথায় তা প্রকাশ করতে শেখে নি। হাসি পেলে হাসে, কান্না পেলে কাঁদে, রাগ হলে রাগ দেখায়, খিদে পেলে খেতে চায়, পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে, খেলার সময় খেলা করে। ওর মতো একটি মেয়ে-শিশুর পক্ষে যা যা করণীয় তা-ই করে। হৃদয়ের অনুভূতিসমূহে যখন যা প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার যেটুকু অবচেতনে ডুবে যাবার ডুবে যায়। যা ভেসে ওঠার তা ওঠে, আর শিশুর মতোই তা প্রকাশ করে। মালিন্য কী, কী-ই বা মাধুর্য, সম্যক কোনো জ্ঞান জন্মে নি। সংসার কী, কী তার নিরন্তরতায় বাধার সৃষ্টি করে, বাজে বা আঘাত করে, সে শিক্ষা কে ওর কাছে আশা করে? বাতুল ছাড়া কেউ করে না।

কিন্তু নমিতা বাতুল না, গোপীনাথ জানে। নমিতা কলির মা, একান্ত মা। মেয়ের কাছে তার কোনো দাবী নেই। কে-ই বা করে এইটুকু মেয়ের কাছে? কেবল আশা পোষণ করা যায়। নমিতাও আশা পোষণ করে তার মেয়ে কলি কেমন হবে। যেমনটি সে চায় মেয়ে যেন তেমনটি হয়, এ আশা করে। সব মা করে।

নমিতার সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। ওর কোনো দোষ নেই। আশাহত হলেও এতো যন্ত্রণা হতো না। বড় অপমানিত হয়েছে। তাই ও এমন করে বলে। অতি আদরের মেয়ের মৃত্যুকামনা করে।

গোপীনাথের বাঁ হাত নমিতার অপুষ্ট বুকে, ডান হাত দিয়ে জড়ানো কলির গুটিসুটি নরম শরীর। ইজের পরা খালি গা। মশার ভয় নেই, একটা মোটা জালি কাপড়ের মশারি টাঙানো। চারজন এক মশারির নীচে। গোপীনাথের দু'দিকে দুই রকমের গন্ধ। নমিতার গায়ে এ সংসারের যাবতীয় কাজ বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্না করা, ছেলেমেয়ে খাওয়ানো, দেখাশোনা, স্বামীর সান্নিধ্য ও সহবাস, সব মিলিয়ে একটি গন্ধ। আর একদিকে মৃদু সুগন্ধ, পাউডারের, গন্ধ তেলের। মেয়ের গন্ধ।

এই দুই গন্ধে মাখামাখি গোপীনাথ, স্বামী ও পিতা, নিজের বাহির জগতের শ্রমের গন্ধ সে টের পায় না।

গোপীনাথ টের পায়, নমিতার বুক হঠাৎ অতিরিক্ত ফুলে ওঠে, তারপরেই গলা থেকে ছিটকে আসা কান্নার স্বর শোনা যায়, 'গলায় দড়ি এমন ভদ্দরলোক হবার। গলায় দড়ি আমার, এমন মেয়ের মা হবার। মরণ হোক আমার।'

গোপীনাথ নমিতার বুকে হাত চেপে ধরে, বলে, 'চুপ করো, ওরা উঠে পড়বে।'

নমিতা বলে, 'উঠুক, উঠে পড়ুক। ওই কালামুখীটা উঠে পড়ুক, চুলের মুঠি ধরে ওকে আমি এই মাঝরাত্রে ঘরের বাইরে বিদেয় করে দেবো।'

গোপীনাথের অজান্তেই মেয়ের গায়ের ওপর হাত আরো নিবিড়-ভাবে চেপে বসে। ভয় পায় মেয়ের ঘুম না ভাঙে। জেগে উঠে এসব কথা যেন শুনতে না পায়। নমিতার গায়ের ওপরও তার হাত নিবিড়তর হয়ে সান্ত্বনায় বাহিত করে। বুকের পাশ থেকে ডানা চেপে ধরে। চুপ করাতে চায়।

'তা তুমি কিছুই পয়সাকড়ি দিতে না পারলে পোয়াতি বউকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন?' নার্সিং হোমের লেডি ডাক্তারের এই কথাটা গোপীনাথের মনে পড়ে যায়।

নমিতার পেটে তখন তার প্রথম সন্তান, এই মেয়ে। এই কলি। নমিতা তখন আসন্নপ্রসবা, পেটে ব্যথা উঠেছে। গোপীনাথ তখন মফঃস্বল শহরের অভিজাত অঞ্চলের কিণ্ডারগার্টেনের মাইনে-করা সাইকেল রিকশাওয়ালা হয় নি। একজন মালিকের রিকশা চালাতো। মালিককে রোজ দিতে হতো পাঁচ সিকা, সারা দিনে যাত্রী জুটুক না-জুটুক। কিন্তু সেই কাজটাকে বলা যেতো স্বাধীন ব্যবসা, যার অনিশ্চয়তার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। কারণ স্টেশন একটা, বাজার একটা, রিকশা শত শত যার কোনো নির্ধারিত সীমা ছিল না। প্রতিযোগিতায়

আর ভাগ্যের ওপর স্বাধীন রিকশাওয়ালার জীবিকা নির্ভর করে।

স্বাধীন রিকশাওয়ালাদের জগৎ আর পরিবেশটাও গোপীনাথের তেমন পছন্দ ছিল না। রিকশা চালাতে গিয়েছিল অভাবের তাড়নায়। ইস্কুলে ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। তার বাবার অভাব যেমন ছিল, সেও তেমনি লেখাপড়ায় একটুও মনোযোগী ছিল না। বখাটে ছেলে বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। দেশ বিভাগের আগে ওদের পরিবারে দ্ররিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রতার একটা নামাবলী ছিল। এদেশে এসে কলোনীর জীবনে তাও গিয়েছিল। এক সময়ে গোপীনাথ ভাবতো, ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোক হয়েই জীবনটা কাটবে। তারপরে গায়ে হাতে পায়ে বড় হয়ে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল, কলে-কারখানায় একটা ভালো কাজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। তখন বিড়ি টেনে, তাস খেলে, রকবাজি করে কাটছিল। নাথতলার বস্তির এক তরকারির ফড়িয়ার মেয়ে নমিতার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতো। নমিতার বাবা ভদ্রলোক ফড়িয়া, ক্রেতাবাবুদের নমস্কার করে কথা বলতো, বাবুরা তাকে 'আপনি' করে বলতো।

গোপীনাথের চটকলে একটা কাজ হয়েছিল, বদলি কাজ। পঁচিশ টাকা হপ্তা। নমিতাকে বিয়ে করতে কে আর তখন আটকাচ্ছিল? নমিতাকেই বা আটকাচ্ছিল কে? চিরদিন কি বদলি থাকতে হবে নাকি! পাকা হবেই, দুদিন আগে আর পরে। কিন্তু চটের হালহদিস অন্যরকম ছিল সে-সময়টায়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দুটো বছর খুব খারাপ চলছিল। বদলি তো দূরের কথা, প্রায় প্রত্যেকটা চটকলেই ছাঁটাই হয়েছিল।

গোপীনাথ চটকলের বিল্লিপত্র গুঁকে রিকশা চালাতে আরম্ভ করেছিল। মদ গাঁজা জুয়া যে ওকে আরো অনেক রিকশাওয়ালার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরতে পারে নি সেটা নমিতার জন্য। নমিতা গোড়াতেই কালসাপের কোমরে ঘা মেরেছিল। ফুঁসলেও সে আর উঠতে নড়তে পারে নি। রিকশা চালাতে গেলেই যদি নেশাভাং

করে জুয়া খেলতে হয়, নমিতারই বা ঘরে ব্যবসা খুলে বসতে অসুবিধা কিসের!

এতো বড় কথা? হ্যাঁ, এতো বড় কথা। ব্যবসা না করতে পারে, নমিতা শহর জুড়ে হুজ্জোত বাধিয়ে দিতে পারে। এতো বড় কথা? হ্যাঁ, এতো বড় কথা। পরিণামে ঝগড়া বিবাদ থেকে গায়ে হাত তোলাও বাদ যায় নি। কিন্তু গোপীনাথকেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে নমিতার গর্ভসঞ্চারও হয়েছিল।

নমিতা ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলে পাড়ারই এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এসেছিল প্রসব করাতে। সে কোথায় কি সব হাত-টাত দিয়ে দেখে বলেছিল, 'সুবিধের বুঝছি নে, পেটের বাচ্চার মাথা খুব বড় ঠেকছে, তুমি বাপু হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

শহরে কোনো হাসপাতাল নেই, নার্সিং হোম আছে। গোপীনাথ সাত-পাঁচ কিছু না ভেবে সোজা সেখানেই নমিতাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। সব শুনে লেডি ডাক্তার সেই কথা বলেছিলেন। গোপীনাথ বলেছিল, 'দিদিমণি যখন ডাকবেন ছুটে আসবো, মিনি মাগনায় আপনার সওয়ারি বইবো, যা কাজ বলবেন করে দেবো। আমাকে উদ্ধার করুন।'

লেডি ডাক্তার বিবাহিতা মহিলা। কয়েকটি সন্তানের জননী। নমিতার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় করুণা হয়েছিল। যদিও গোপীনাথকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের আবার কথার ঠিক! কাজ হয়ে গেলে আর তোমার পাত্তা আমি পাবো?'

পেয়েছিলেন। গোপীনাথের এই কৃতজ্ঞতাবোধ মহিলাকে খুশি করেছিল। নমিতার স্বাভাবিক প্রসব হলেও তিনি বিনা পয়সায় অনেকদিন ওষুধ দিয়েছেন। গোপীনাথের মেয়ের ওজন হয়েছিল আট পাউণ্ড। তাতেও তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। নমিতাও প্রায়ই নার্সিং হোমে গিয়ে কিছু কাজকর্ম করে দিতো। একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গোপীনাথের মেয়েটা যতো বড় হয়েছিল, ততো কলকল

করে পাকা পাকা কথা বলতো। লেডি ডাক্তার নিজে নাম দিয়েছিলেন, কলকলি। তারপরে কলি। কলি দাস।

কলি যখন তিন বছরের, তখন গোপীনাথের একবার অসুখ করেছিল। তখনো ওষুধ দিয়েছিলেন সেই মহিলা ডাক্তার। নমিতা তখন দ্বিতীয়বার গর্ভবতী। গোপীনাথ ভালো হবার পরে কিণ্ডারগার্টেনের রিকশাওয়ালার কাজটা পেয়েছিল। সামনে পিছনে তিনটি শিশু মুখোমুখি বসে। হালকা ওজন, টানতে কষ্ট হয় না। বেতন একশো টাকা। দুপুরে টিফিন। সকাল ন'টা থেকে এগারোটা, বেলা একটা থেকে ছুটো রিকশা টানা। শিশুদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা, বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ যাত্রী নয়, যথেষ্ট দায়িত্বের কাজ। শিশুদের নিয়ে সাবধানে তাকে চলাফেরা করতে হয়।

তারপরে বেতন বেড়ে হলো একশো পঁচিশ টাকা। দিদিমণিদের ছোটখাটো ফাইফরমায়েস খাটার দরুন। মাঝে মাঝে কিছু উপরি জোটে শিশুদেব অভিভাবকদের কাছ থেকে। গোপীনাথের জীবনটা সাধারণ রিকশাওয়ালাদের তুলনায় বদলিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা কলিকে নিয়ে পড়াতে বসতো। নিজেও নানান বইপত্র যোগাড় করে পড়াশোনা করে। কলিকে দেখা গেল লেখাপড়ায়ও ও কলকলিয়ে উঠছে। মনোযোগ আছে, মনে রাখতে পারে।

গোপীনাথ আর নমিতার সাধ হলো, কলি কি কিনডারগার্টেন ইস্কুলে পড়তে পারে না? কলির মতো মেয়েদের গোপীনাথ যখন কোলে করে রিকশায় তোলে, সাবধানে নিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে গল্প করে, গল্প করে ভুলিয়ে রাখে, কান্না থামায়, রাগ-অভিমানে সান্ত্বনা দেয়, সামলায়, তখন নিজের মেয়ে কলির কথা বড় মনে পড়ে। ইচ্ছা করে কলিকেও তেমনি করে নিয়ে যায়। দেখতে ইচ্ছা করে, ইস্কুলের মাঠে কলিও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটে ছুটে খেলা করুক। দৌড়ঝাঁপ করুক, দিদিমণিদের আদর আর বকুনি খাক, লেখাপড়া শিখুক।

গোপীনাথের মনের কথাটি শোনা মাত্র নমিতার প্রাণটাও উছলিয়ে উঠেছিল। আহা, কেন নয়? অতএব গোপীনাথ প্রথমে —আর সেই শেষ, এক ছোট দিদিমণিকে মনের কথা বলেছিল। দিদিমণি অবাক আর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এ কথা বলছো কী করে গুপী? শহরের নামকরা বড়লোক ভদ্রলোকদের ছেলেমেয়েরা যে কে-জি ইস্কুলে পড়ে, তোমার মেয়ে সেখানে পড়বে? শোনা মাত্রই তো তাঁরা ক্ষেপে যাবেন। ওঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একটা রিকশাওয়ালার মেয়ে পড়বে, এ কি ভাবা যায়!'

গোপীনাথ কেন্নোর মতো গুটিয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে চলে এসেছিল। নমিতা শুনে প্রথমে রেগে উঠেছিল, তারপর কেঁদেছিল, 'বড় অপরাধ করেছি।'···কিন্তু গোপীনাথের চিত্ত অশান্ত হয়েছিল। কথাগুলো শেলের মতো বিঁধছিল। কেন? কলি আমার মেয়ে বলে ভদ্রলোকের মেয়ে নয়? গরীব হতে পারি, না হয় মাসে স্বামী-স্ত্রী চার বেলা খাবো না। না-হয় আট টাকা। বড়লোক না হলে কি ওখানে মেয়েকে পড়ানো যাবে না? গোপীনাথ তো সব শিশুদের ভালবাসে। তাদের কারোর শরীর খারাপ হলে, ইস্কুল কামাই করলে, মন খারাপ হয়। কাজের অবসরে বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে কেমন আছে। তা না হলে মন খচ্‌খচ করে। আমার কলি কি এমন দুর্ভাগী, আমি নিজে তাকে নিয়ে যেতে পারবো না?

স্বামী-স্ত্রীতে মন্ত্রণাসভা হয়েছিল। খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল এক বিধবা মহিলার, গোপীনাথদের বস্তির কাছেই দোতলা বাড়িতে থাকেন। তাঁর নামে নানান দুর্নাম, তবু শহরের সম্পন্ন ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা। বয়স হয়েছে, তাঁর চারটি মেয়ে আছে। দু'জনের বিয়ে হয়েছে, দুজনের হয় নি। বিবাহিতা মেয়েরাও মায়ের কাছেই থাকে। মেয়েদের ঘিরেই দুর্নাম।

গোপীনাথ এবার অনেক ভেবেচিন্তে মা-ঠাকরুণের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল। মা-ঠাকরুণ রাজী হয়েছিলেন। কলিকে নিজের দৌহিত্রী বলে পরিচয় দিয়ে কে-জি স্কুলে ভরতি করাতে সম্মত

হয়েছিলেন। গোপীনাথ আর নমিতা কলিকে ওর মিথ্যা পরিচয়টা পাখীর মতো পড়িয়েছিল। কলকলানি কলি তা বুঝতে পেরেছিল। ফিক করে হেসে বাবার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'তুমি এখন থেকে আমার রিকশাওয়ালা গুপীদাদা ?'

কলির ইস্কুলের বেতন মাসিক আট টাকা গোপীনাথ খরচ করতে দ্বিধা করে নি। মাসিক রিকশা ভাড়া দশ টাকাও। বড় গোপন ব্যাপার। কাজটা খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছিল। ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গোপীনাথের তেমন ভয় ছিল না। কলিকে কেউ তাঁরা গোপীনাথের মেয়ে বলে চিনতেন না। অন্য কোনো রকমের খোঁজখবরের দরকারও বিশেষ হতো না। গোপীনাথের ভয় ছিল ওর নিজের বস্তিবাসীদের নিয়ে, নিজের মেয়েকে নিয়ে, নিজের আবরণকে নিয়ে। সে যেন কখনো না কলিকে নিজের মেয়ে বলে ভুল করে। কলি না করে নিজের বাবাকে দেখে। বস্তিবাসীদের অবিশ্যি এমন একটা ধারণা হয়েছিল, গোপীনাথ স্বতন্ত্র, তার মেয়ে ভদ্রলোকের মতো মানুষ হবে, সেটা এমন আশ্চর্যের কিছু না।

এক বছর ধরে সমস্ত ব্যাপারটি এমনভাবে চলছিল, গোপীনাথের চোখেও আর কোনো রকম অস্বাভাবিক ঠেকছিল না। মেয়ে বাড়ি থেকে ইস্কুলের য়ুনিফরম পরে চলে যেতো দোতলা বাড়ির ভিতর উঠোনে। গোপীনাথ রিকশার ভেঁপু ফুঁকলেই কলি চলে আসতো। কলি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করতো। দিদিমণিদের সঙ্গে কলকল করতো। আদর খেতো, দুষ্টুমি করলে চোখপাকানো মিষ্টি বকুনি। মাথার চুলের ঝুঁটিতে বাঁধা রঙিন ফিতে উড়িয়ে মাঠে সকলের সঙ্গে খেলা করতো। গোপীনাথ দূর থেকে লুকিয়ে দেখতো। মনটা ভরে উঠতো এক অনির্বচনীয় সুখে। মনে হতো, বাগানে ফুলের খেলা দেখছে, তার মধ্যে একটি তার নিজস্ব। তার আত্মজা।

কলি লেখাপড়ায় ভালো। অন্য বাড়ির শিশুদের মায়েরা ওর গাল টিপে আদর করতো, 'মেয়েটি ভারি মিষ্টি।' গোপীনাথ

রিকশাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে থাকতো। বুকে সুখের ঢেউ খেলতো, এমন কি চোখে জল এসে পড়তো। কোনো কোনো শিশু ছাড়তে চাইতো না, কলিকে জোর করে বাড়িতে নামিয়ে নিতো। খেলনা খাবার দিতো। ফিরে এসে বলতো, 'চলো গোপীদাদা।' ব্যথা কি একটু বাজতো না? সে ব্যথার মধ্যে সুখ ছিল আরো গভীর।

কলি না সত্যি মিষ্টি। নমিতার মনেও একই সুখের প্রস্রবণ। মেয়ের সঙ্গে কথায় পারে না। কলির কচি মুখে আবার ইংরেজি বুলি। মাগো! নমিতার হাসতে চোখে জল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই গর্ব।

একটা বছর কাটলো। কলি কে-জি ওয়ানে উঠলো, ভেরি গুড মার্ক পেয়ে। গোলমালটা হলো আজ সকালে। গোলমালটা পাকাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। কলির প্রায়ই থেকে থেকে মন খারাপ। মুখ গম্ভীর। কথা বলে না, হাসে না। সব সময়েই কেমন ছিটকে ছিটকে যায়। কী হয়েছে তোর? কোনো কথা নেই। ঠোঁট টিপে থাকে। মুখ গোঁজ করে থাকে। এ আবার কেমন ধারা?

আজ রবিবার। আজ সকালে আসল কথা জানা গেল। নমিতা বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোর হয়েছে কী? প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকিস যে সব সময়?'

কলি ফুঁসে রুষে কলকলিয়ে উঠলো, 'প্যাঁচা আমি, না তুমি আর বাবা? আমি আর তোমাদের মেয়ে থাকতে চাই না।'

নমিতা প্রথমে যেন কথাটা বুঝতেই পারে নি। বললো, 'কী বললি?'

কলি বললো, 'তোমরা তো ছোটলোক। আমি রিকশাওয়ালার মেয়ে হতে চাই না।'

নমিতার সহ্যের সীমা শেষ, কষালো এক থাপ্পড়। তারপরে দুই থাপ্পড়, 'মুখপুড়ী, তুই রিকশাওয়ালার মেয়ে না তো কোন্ রাজার বেটি? কোন্ মন্ত্রী তোর বাপ, অ্যাঁ?'

গোপীনাথ এসে না পড়লে আরো মার খেয়ে মরতো। কিন্তু কলির মুখ শক্ত, ঠোঁটে ঠোঁট টেপা, চোখে জল। তবু মেয়ে কাঁদলো না, বললো, 'আমি তোমাদের মেয়ে নই।'

সকাল থেকে বলতে গেলে রান্না-খাওয়া বন্ধ। গোপীনাথ কলিকে আদর করে সোহাগ করে অনেক বুঝিয়েছে। তারপরে বলেছে, 'আচ্ছা তুই আমাদের মেয়ে নোস্, হলো তো ?'

কলি বলেছে, 'ইস্কুল থেকে এ বাড়িতে আমার আসতে ইচ্ছে করে না ?'

গোপীনাথের বুকটা বড় টনটন করেছে, বলেছে, 'কোথায় যাবি ?'

কলি ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, 'জানি না। তোমাদের ভালো লাগে না।'

গোপীনাথ বলেছে, 'বেশ, আর একটু বড় হ, আরো পড়াশোনা করে নে, তারপরে চলে যাস।'

কলি আর কিছু বলে নি। কিন্তু নমিতার পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব ছিল না। রেঁধেবেড়ে সবাইকে খাইয়েছে, নিজে খায় নি। এখন বুকের মধ্যে পুড়ছে, জ্বলছে আর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, আর এইসব কথা বলছে।

গোপীনাথ শেষ কথা বললো, 'ঘুমোও। ছেলেমানুষের মন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সকলবেলা কলি তেমনি গম্ভীর, মুখ অন্ধকার। মায়ের মুখের দিকে তাকালো না। গোপীনাথ নিজে কলিকে ইস্কুলের জন্য তৈরি করে রিকশার হাজিরা দিতে চলে গেল। ইস্কুল থেকে রিকশা নিয়ে দোতলা বাড়ির সামনে এসে ভেঁপু ফুঁকতে লাগলো। কিন্তু কলি আর বেরোয় না। গোপীনাথ নিজে যখন রিকশা থেকে নামতে উদ্যত হলো, তখন কলি কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে বেরিয়ে এলো। গোপীনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস, করলো, 'আবার কী হলো ?'

কলির রুদ্ধ স্বর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'মা আমাকে ও আদর করে নি।'

গোপীনাথের মনটা হু-হু করে উঠলো, বললো, 'তাতে কী হয়েছে? আয়, আমি তোকে আদর করি।'

কলি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না না, আমি ওই ইস্কুলে যাবো না। আমার মিছে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

গোপীনাথ বললো, 'কেন?'

কলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'সকলের বাবা মা আছে। আমার নেই।'

গোপীনাথ কিছু বলতে গেল। কলি বললো, 'না না, আমি আর তোমাকে গুপীদাদা বলতে পারবো না। আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।'

বলেই কলি বস্তির দিকে ছুটতে লাগলো। ওর মাথার ঝুঁটিতে ফিতে উড়ছে। হাতে বইয়ের ব্যাগ। গোপীনাথ তাকিয়ে রইলো। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠলো, আর সকালের রোদ টলটল করে দুলতে লাগলো।

মূল্যবোধ

'আরে শোভনের কথা বাদ দিন তো! ওর কথার কোনো ঠিক আছে নাকি?' সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক রাধাবিনোদ বললেন, 'দেখুন গিয়ে, কোথায় হয়তো মাতাল হয়ে পড়ে আছে। আজকের বৈঠকের কথা হয়তো ওর মনেই নেই।'

সাহিত্য বিভাগের সভাপতি কৃষ্ণ চৌধুরী যুগপৎ ক্ষমা ও ক্ষুব্ধ ভাবের ঈষৎ মিশ্রিত হাসি হেসে বললেন, 'একটু-আধটু মদ দিন বুঝে সময় বুঝে আমরাও খাই। খাই না? তা বলে শোভনের মতো—।'

না, দিন বুঝে সময় বুঝে বিশ্বসংসারের সবাই কিছু ওই জঘন্য

জিনিস গেলে না।' সত্যসিন্ধু রীতিমতো বিরক্ত স্বরে প্রতিবাদ করলেন। তিনি রাধাবিনোদ বা কৃষ্ণ চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নামকরা পণ্ডিত নন বটে। একটি বৃহৎ ফার্মের একজিকিউটিভ, কিন্তু বিদ্বৎসমাজে বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। যাকে বলে 'হারাম', মদ্যপান তাঁর কাছে সেই রকম। কৃষ্ণ চৌধুরী অবিশ্যি মিথ্যা কথা বলেন নি, এবং কেউ-ই তথাকথিত মাতাল বা সুরাপায়ী নন্ এবং সত্যসিন্ধু যথেষ্ট বন্ধুবৎসল ব্যক্তি। হেসে বললেন, 'মাঝে-মধ্যেও ভাই আপনারা যে কী স্বাদে এই বিষগুলো খান, আমি বুঝতে পারি না।'

খ্যাতিমান সমাজতত্ত্ববিদ ব্যোমকেশ বললেন, অথচ আপনি যে-কোম্পানির বিজনেস একজিকিউটিভ, সেই কোম্পানির ককটেল পার্টি লেগেই আছে। আর আপনাকে সেই সব পার্টিতে হাজিরও থাকতে হয়।'

'থাকতে হয় মানে?' সত্যসিন্ধু প্রায় টাকের কাছে ভুরু তুলে বললেন, 'অ্যারেঞ্জমেনটের দায়-দায়িত্ব পর্যন্ত আমার।'

'অথচ আপনার ভারজিন লিপে একটা সিগারেট আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি।' দিগেন্দ্রনাথ বললেন। যদিও তিনি একজন্ স্যানিটারি মেটিরিয়ালের ব্যবসায়ী, কিন্তু সবাই তাঁকে দুর্দান্তানন্দ ধর্মীয় সমাজের একজন বিশিষ্ট সেবক বলে জানে। সেই সাত-সকালে পুজোশেষে কপালে লাগানো চন্দনের ফোঁটাটি এখনো প্রায় অমলিন, 'এসব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমারও অনেক মিল। কিন্তু শোভন থাকলেও এখন কী বলতো বলুন তো!'

'আপনার আর সত্যসিন্ধুবাবুর মুখ থেকে ভাতের গন্ধ বেরোয়।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'শোভন ঠিক এই কথাই বলতো।'

সত্যসিন্ধুবাবু ভারি উদার হেসে বললেন, 'শোভনের কথা আলাদা। ওর ওপরে আমি রাগ করতে পারি না। সেটা যে কেবল ও নাট্যকার বলে তা নয়, মেয়েদের সম্পর্কে ওর বাছ-বিচার নেই—মানে, লম্পট—মাতাল। সবই, কিন্তু ওর মনুটা

ভারি পরিষ্কার, প্যাঁচ-ট্যাঁচ নেই—মানে, কী বল তো—ও যেন সব কিছু উজাড় করে দিতেই এসেছে, তাই না? যা আমরা—সত্যি বলতে কি—ইয়ে—মানে, পারি না। ঠিক কী না, অ্যাঁ?' তিনি তর্জনী তুলে গালের ভাঁজে ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

ঘরের সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কেমন একটা অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তাঁদের সকলের চোখে-মুখে। অথচ একটা রহস্যজনক হাসি চিকচিক করছে সকলেরই চশমার কাঁচে। হ্যাঁ, রাধাবিনোদ ছাড়া সকলের চোখেই চশমা।

'ওহ্, বাট নো নো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস!' সত্যসিন্ধু যেন চকিত চমকে, হাসি ও উদ্বেগে বলে উঠলেন, 'তা বলে আমি শোভনের ওই সব ব্যাপারগুলোকে মোটেই সমর্থন করি না। ওর ওই সব সঙ্গী—মানে, সঙ্গিনী-টঙ্গিনী—।'

সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আমরাও তো সেই কথাই বলছি মশাই। দোজ অল ভালগার ক্রিচার্স—।'

'আফটার অল্ আমরা কোনো ইমমর‍্যাল ট্রাফিকের অংশীদার হতে পারি না।' দিগেন্দ্রনাথ বললেন, 'শোভনের কাছে যা জল ভাত, ঠিক কী না?'

ব্যোমকেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই যে আমাদের কৃষ্টি, যা নান্দনিকতা আর সৌন্দর্যের প্রতীক—মানে, আমরা যার উপাসক—।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে আমরা ছিটকে যাচ্ছি।' কৃষ্ণ চৌধুরী, 'বললেন শোভনের প্রসঙ্গটা এমন একটা ব্যাপার নয় যে আমরা আর সব ভুলে যাবো।'

রাধাবিনোদ বললেন, 'মোটেই তা হতে পারে না। তবে আমি বলছিলাম কি, মহাভারতীয় নন্দন পরিষদের কনফারেন্সের আলোচনা কি আজ সম্ভব? প্রিনসিপ্যাল বকুলদির নকল দাঁত গতকাল সন্ধ্যেয় সেট করা হয়েছে, উনি আসতে পারবেন না। নগর কলুষমুক্ত সমিতির অরবিন্দবাবু মাথায় কলপ মেখে সারা মুখে

মাথায় সাংঘাতিক র‍্যাশ বেরিয়েছে, ঘর থেকে বেরোতেই পারছেন না। চণ্ডীচরণবাবু—।'

'আহা, এত কথার দরকার কী?' ব্যোমকেশ বললেন, 'কনফারেন্সের আলোচনা আজ না হয় মুলতুবীই থাক। সত্যসিন্ধু-বাবুর বাড়িতে আমরা রয়েছি, বিপত্নীক মহোদয়ের বাড়িতে আজ না হয় আমরা কিঞ্চিৎ—।'

'মদ্যপান?' সত্যসিন্ধু টাকে ভুরু তুলে আঁতকিয়ে উঠলেন।

'মোটেই না। চা চা চা—আর ফুলকপির সিঙাড়া—আপনার পাচিকার হাতে তৈরি।' কৃষ্ণ চৌধুরী বলে উঠলেন।

সত্যসিন্ধু ভ্রূকুটি-সন্দিগ্ধ চোখে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে আকর্ণ হেসে মাথা ঝাঁকালেন। সবাই হা-হা হে-হে করে হেসে উঠলেন।

'কিন্তু কেষ্টবাবু, সেই মেয়েটির গল্পটা শুরুতেই থামিয়ে দিলেন।' দিগেন্দ্রনাথ করুণ মুখে আবেগের স্বরে বললেন, 'দেয়ার ইজ সামথিং! আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

সত্যসিন্ধু ব্যস্তভাবে বললেন, 'এক মিনিট কেষ্টবাবু, আমি চা খাবারের কথাটা ভেতরে বলে আসি।'

কৃষ্ণ চৌধুরী হেসে বললেন, 'আরে মশাই, গল্পটা তো কাগজে বেরিয়েছে, পড়ে নেবেন।'

'পড়ার সময় কোথায় আমাদের বলুন?' ব্যোমকেশ বললেন, 'তাও আবার গল্প-উপন্যাস। আপনি হলেন রুচিশীল পাঠক, তুরন্ত সমালোচক। আমরা আপনার মুখ থেকেই গল্পটা শুনতে চাই।'

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে সমর্থন করলেন। সত্যসিন্ধুও ফিরে এলেন। সকলেরই বয়স চল্লিশের ঘর থেকে পঞ্চাশের ঘরে। মাথায় টাক, ধূসর ও কালো চুল, রোগা লম্বা মোটা, ধুতি পাঞ্জাবি ট্রাউজার শার্ট বিভিন্ন রূপের একটি জমাট ঐক্যের সমাবেশ।

কৃষ্ণ চৌধুরী একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'গল্পের বিষয়বস্তু এমন কিছু অভিনব নয়। পড়ন্ত

মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি রূপসী তরুণীর করুণ পরিসমাপ্তি গল্পের বিষয়বস্তু বলতে পারেন। বলতে পারেন মানে, ব্যাপারটা তাই-ই। লেখকের লেখার গুণে গল্পটি হয়ে উঠেছে একটা আশ্চর্য সৃষ্টি, যাকে বলে মহৎ-সুন্দর করুণ।'

'হোয়াট এ ল্যাঙ্গুয়েজ।' ব্যোমকেশ বলে উঠলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী হাত তুলে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'লেখক যেখানে মেয়েটির চেহারার বর্ণনা দিয়াছেন, ইউনিক। অধিকাংশ লেখক যা করে থাকেন, এই লেখক মোটেই তা করেন নি, অর্থাৎ যাকে বলে ইংরেজি ঘেঁষা বাঙলায় বর্ণনা। রাজশেখর বসু যাকে বলেছেন ইংরেজির গাধাবোটবাহিনী বাঙলা জগাখিচুড়ি ভালগার, এই লেখক সেদিক দিয়েই যান নি।'

'কী চমৎকার ব্যাখ্যা।' দিগেন্দ্রনাথ বললেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী হাত তুলে দিগেন্দ্রনাথকে থামিয়ে বললেন, 'এই লেখক তরুণীর রূপের ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রীয় লক্ষণের যে মৌল বর্ণনার ভাষা সেই ভাষায়। যেমন, রঙ তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, রক্তকপোল বিম্বোষ্ঠা, অশাণিত উচ্চ নাসা, আয়ত বঙ্কিম চোখ, স্বল্পকুঞ্চিত কেশপাশ, সীমিত কপাল। মনে রাখবেন, শাস্ত্রীয় লক্ষণে নারীর ঘন কুঞ্চিত কেশ অলক্ষণে। পীন বক্ষ—।'

'বাহ্‌বা।' সত্যসিন্ধু বিগলিত বিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'শুনুন। কিন্তু যেন অশক্ত গাছের ডালে কিঞ্চিৎ ভারাবনত যুগল ফল।'

'অতুলনীয়, যেন দেখতে পাচ্ছি।' দিগেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন।

ব্যোমকেশ বললেন, 'আর বেরিসকের মতো কথা বলবেন না, এর পরে হয়তো বলবেন, যেন ছুঁতে পাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি চোখে দিগেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ চৌধুরী বলে গেলেন, 'সুবর্ণ দেহটি নির্লোম, ক্ষীণ কটি, মেদহীন নাভিস্থলে নিম্নগামী কোনো রোমরেখা নেই। মনে রাখবেন,

নাভিস্থলের রোমরেখা রমণীদের অলক্ষণ এবং ঘনবদ্ধ বিশাল শ্রোণিদেশ, স্বর্ণস্তম্ভ উরু ও জানুদেশ।'

'এক কথায় অপরূপ।' রাধাবিনোদ বললেন।

'এবং পবিত্র।' সত্যসিন্ধু তেমনিই বিগলিত স্বরে বললেন, 'যে পবিত্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠ অলংকার।'

দিগেন্দ্রনাথ বললেন, 'মশাই, শাস্ত্রে আর এমনি এমনি রমণীর সুলক্ষণগুলো বিচার করা হয়েছিল! কেষ্টবাবু, লেখক মেয়েটির কী নাম দিয়েছেন?'

'অধরা।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন।

'অধরা?' সত্যসিন্ধুর টাকে যেন মেঘ নেমে এলো।

সকলের চোখে-মুখেই একটা আহত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। কৃষ্ণ চৌধুরী করুণ অথচ বিজ্ঞ হেসে বললেন, 'জানি এমন একটি মেয়ের এ-রকম নাম আপনাদের পছন্দ হলো না। লেখক গল্পটির নামও দিয়েছেন, অধরা। আর এখানেই লেখকের মুন্সিয়ানা। অধরা যদি এ-রকম কোনো বিশেষণ হতো, অধর দিয়ে যার তুলনা দেওয়া যায়, তাহলে মেয়েটিকে রক্তাধরা বলা যেত। কিন্তু অধরাকে অধরাই করেছেন। সেইখানেই আমাদের আজকের সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে, নারীর সংগ্রামের ইতিহাস, এই অবক্ষয়িত সমাজের বুকে ফুটে উঠেছে সেই কাহিনী।' কৃষ্ণ চৌধুরী করুণ গম্ভীর মুখে আবার সিগারেট ধরালেন।

সিগারেট ধরালেন রাধাবিনোদ এবং ব্যোমকেশ। সকলেই গম্ভীর। কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'অধরা টাকার অভাবে পার্ট টু পরীক্ষা দিতে পারে নি। বাবা শয্যাশায়ী, মা অসহায়, ভাইগুলো মস্তান—যাদের আমি আপনারা ভালোই চিনি। আর এর মাঝখানে অধরা একটি হীরকখণ্ডের মত জ্বলজ্বল করছে, যার চারপাশে লোভী জহুরীরা দিনরাত্রি ঘোরাফেরা করছে।'

'মর্মন্তুদ!'

'দুঃসহ!'

'তারপর ?'

কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'মনে রাখবেন, অধরার পরেও আছে পর পর দুটি বোন। কিন্তু এই মাংসলোলুপ পশুগুলো বাড়িতে আনাগোনা করতে পারছিল কেন ? মস্তান ভাইগুলোর জন্যই। অধরা কী দেখলো ? সংসার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ও-ই পারে সংসারটাকে বাঁচাতে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে ?'

'রূপ !'

'দেহ !'

'আহ্, অসহ্য লাগছে। তারপর ?'

কৃষ্ণ চৌধুরা বললেন, 'অধরা জীবনযুদ্ধে নামলো। সৎভাবে বাঁচবার, বাঁচাবার যুদ্ধ।'

'আহা, শুনে শান্তি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'অধরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি। অফিসপাড়া থেকে প্রেস দপ্তরীখানা হোসিয়ারি ফ্যাক্টরিতে। কোথাও যেতে বাদ রাখে নি। কাজ কি কোথাও পায় নি ? পেয়েছে কিন্তু থাকতে পারে নি। মাংসলোলুপদের হাত সর্বত্র। অধরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে। প্রজাপতির সনির্বন্ধ বেচারীর কপালে ছিল না। শেষ পর্যন্ত—হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ।'

'আত্মসমর্পণ !' সকলেই আর্তনাদ করে উঠলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'না, আত্মসমর্পণ নয়, আত্ম-বলিদান। দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ, আত্মহত্যা, সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্য, অধরা চিরদিন অধরাই রয়ে গেল।'

'গ্রেট গ্রেট !'

'এই হলো আমাদের নারীদের প্রকৃত রূপ।'

'ছিন্নমস্তার কথা মনে পড়ছে আমার।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'এটাই হলো আমাদের মূল্যবোধের নিরীখ্। কোনো কারণেই এই মূল্যবোধকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না।'

'নিশ্চয়।'

'এই মূল্যবোধই তো আমাদের সম্বল।'

'আমাদের জীবনে—।' সত্যসিন্ধু থমকিয়ে চুপ করলেন।

সকলের দৃষ্টি পড়লো দরজার দিকে। শোভন আর তার পাশে একটি রূপসী তরুণী। শোভনের মুখ চোখ অবিন্যস্ত চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে মদ্যপান করেছে। সঙ্গের তরুণীটির আয়ত চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তিম। কিন্তু শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে সব মিলিয়ে তার রূপের ঝলক ঘরের মধ্যে বিচ্ছুরিত হলো। অপরিচিত ব্যক্তিদের সামনে সে কিছুটা ব্রীড়াময়, মোহসঞ্চারী বিম্বোষ্ঠে সলজ্জ হাসি। সুরার মৃদু গন্ধের সঙ্গে একটি হালকা সুগন্ধও ছড়িয়ে পড়ছে। শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে একটু অমিল, তরুণীর বক্ষস্থল অনম্র উদ্ধত।

শোভন হেসে বললো, 'পরিচয় করিয়ে দিই, আমার নতুন নাটকের হিরোয়িন, শ্রীমতী ধরা।'

সকলের চোখে-মুখেই একটি বিস্মিত হাসির উজ্জ্বল ঝিলিক। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'ধরা!'

'হ্যাঁ, ধরা দেবী। বী-টা বাদ দেবেন না যেন।' শোভন হেসে বললো।

শ্রীমতী ধরা হাত দুটি তুলে নমস্কার করলেন। সকলেই নমস্কার করে একযোগে আহ্বান করলেন, 'আসুন, আসুন ধরা দেবী।'

শোভন বললো, 'আহা, ওর মতো একটি মেয়েকে—ব্যক্তিগত চরিত্র-টরিত্রের কথা বাদ দিন, একজন সুন্দরী রূপসীকে এভাবে ডাকলেই হয়? হাত ধরে নিয়ে যান!'

ঘরের মধ্যে একটা দমকা ঝড়ের পূর্ব-মুহূর্তের স্তব্ধতা। দিগেন্দ্রনাথ দ্রুত কপাল থেকে চন্দনের ফোঁটা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপরে পাঁচজনই একসঙ্গে দরজার দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন।

'আহা, আস্তে আস্তে। সবাই মিলে ঝাপটে ধরলে ধরা ভয় পেয়ে যাবে না?' শোভন বললো।

শ্রীমতী ধরা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

শোভন বললো, 'সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িটাই নিরাপদ, তাই ধরাকে এখানেই নিয়ে এলাম। আসুন, সবাই এসে একে একে ওকে নিয়ে যান।'

তৎক্ষণাৎ সবাই শ্রীমতী ধরার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কে আগে হাত ধরবেন ঠিক করতে পারছেন না। ধরা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর ওর অধরা ধরা-ধরা তনু যেন এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়লো। এবার ধরার গলার সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে হেসে উঠলেন, আর সবাই তাকে স্পর্শ করে ঘরের মধ্যে নিয়ে চললেন।

শোভন বললো, 'আমাকে কিন্তু একটু খাওয়াতে হবে।'

'হবে হবে, নিশ্চয় হবে।' সত্যসিন্ধু এবং সবাই উল্লাসে কলকলিয়ে উঠলেন।

সামান্য ঘটনা

সামান্য ঘটনাই অনেক সময় এমন অসামান্য রূপ নিয়ে দেখা দেয়, নিজেরই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুকাল আগে। ঋতুর দিক থেকে এবং ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সময়টা ছিল গ্রীষ্মকালের বেলা প্রায় তিনটে। স্থান, কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থল। আমার প্রতীক্ষা একটি ট্যাক্সির জন্যে। আমার এমনই ভাগ্য, বিশেষ করে এই স্থানটিতে ট্যাক্সি পেতে বরাবরই আমাকে দীর্ঘ-সময় অপেক্ষা করতে হয়। বিরক্তির আর সীমা থাকে না। জায়গাটাও এমনই, সকাল দুপুর সন্ধ্যে সব সময়েই যেন ট্যাক্সি-যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে, ফলে দৌড়াদৌড়িও করতে হয়, একটা প্রতিযোগিতা লেগে যায়।

বিশেষ যে-দিনটির কথা আমি বলছি, সেদিন আমার ভাগ্যকে যথেষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে। সামান্য সময় অপেক্ষা করতেই একটি

ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভিতরে বসলাম, ড্রাইভার মিটার ডাউন করলেন। এমন সময়ে দুটি মহিলা গলদঘর্ম অবস্থায় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গরমে ঘামে তাঁদের সাজসজ্জা কিছু বিস্রস্ত ও ম্লান হয়ে পড়েছে। একজন সঙ্কোচ ও লজ্জার সঙ্গে হেসে জানতে চাইলেন, আমার গন্তব্য কোথায়? আমার গন্তব্য শুনে তিনি বিব্রত ও বিনীত অনুরোধ করলেন, তাঁদের যদি মধ্য কলকাতায় একটি বিশেষ সিনেমা-গৃহের সামনে নামিয়ে দিই, বিশেষ কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবেন। অবিশ্যি ভাড়া দিয়ে দেবার ভদ্র সান্ত্বনাও দিলেন। কিন্তু সময় মোটেই নেই, তাঁদের যেতেই হবে।

আমি মনে মনে কিছুটা বিরক্ত আর অপ্রস্তুত বোধ করলেও তাঁদের অবস্থা দেখে করুণা হলো। আমি পিছনের আসন থেকে নেমে সামনের আসনে যেতে যেতে বললাম, 'উঠে পড়ুন, দেরি করবেন না।'

মহিলা দুজনেই তরুণী। একজনকে মনে হলো বিবাহিতা, আর একজন সম্ভবতঃ অবিবাহিতা। আমার আচরণে দুজনেই অবাক হলেন, একজন বললেন, 'সে কি, আপনি সামনে গেলেন কেন, পেছনেই বসুন না।'

আমি বললাম, 'সেটা সম্ভব নয়। সঙ্কোচ না করে বসুন, আপনারা নেমে গেলে আমি আবার পেছনেই গিয়ে বসবো।'

তরুণীরা নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করে উঠে বসলেন। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলো। গাড়ির মধ্যে তাঁদের প্রসাধনের এবং ব্যবহৃত বিলিতি সুগন্ধির গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমার মনের বিরক্তি একটুও কাটলো না, বরং বাড়তেই লাগলো। সিনেমায় যখন যেতেই হবে এবং ট্যাক্সিতে বা অন্য কোনো ভাড়াটে পরিবহনের মারফৎ, তখন হাতে আরো সময় নিয়ে বেরোনো উচিত। এরকম তাড়াহুড়ো করে যেন তেন প্রকারেণঃ উপায়ে যেতেই হবে এটা ঠিক নয়। বুঝতে পারছি এসব ভেবে

কোনো লাভ নেই, কিন্তু মনের অস্বস্তি আর বিরক্তি আমাকে ভাবাচ্ছে।

পিছনের আসনে তরুণী মহিলা দুজন নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছেন, খুবই নিচু স্বরে। আমার অনুমান হলো, তাঁরা কোনো একটা ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করছেন। 'হ্যাঁ' 'না' 'উহুঁ' বা 'বলছি' এই জাতীয় দু-একটি কথা থেকে আমার অনুমান হলো, অথবা আদৌ হয়তো তা নয়।

যাই হোক, রাস্তায় যানবাহনের তেমন ভিড় না থাকায় মধ্য কলকাতার সেই সিনেমা গৃহের সামনে পৌঁছুতে বিশেষ বিলম্ব হলো না। ওঁদের দুজনের মধ্যে একজন তাঁর ব্যাগ খুলে টাকা বের করলেন। আমি সামনের আসন থেকে নেমে বললাম, 'এটার জন্যে ভাববেন না, আমাকে এ রাস্তায় যেতেই হতো। আপনাদের আর দেরি করা উচিত নয়, শো বোধ হয় শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

ওঁরা দুজনেই গাড়ি থেকে নামলেন। দুজনের দৃষ্টিতেই বিশেষ একটি কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। বিবাহিতা তরুণী জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কেমন চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

অযৌক্তিক এবং হাস্যকর প্রশ্ন। আমি হেসে বললাম, 'বোধ হয় যেখান থেকে ট্যাক্সিতে উঠলাম, সেখানেই অনেকবার দেখে থাকবেন।'

আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলাম। তরুণী আবার জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

হেসে বললাম, 'কেন নয়? আমি গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নই।' বলে আমার নাম বললাম।

শুনেই দুজনের মুখে একটা ত্রস্ত চমকের পরিবর্তন দেখা দিল। অবিবাহিতা বললেন, 'আমি তো তোমাকে তখন থেকেই বলছি, তুমিই মানতে চাইছিলে না।'

বিবাহিতার মুখে লজ্জার ঝলক, কিন্তু বিমর্ষতার ছাপটাও

স্পষ্ট। বললেন, 'আশ্চর্য, আমি একবারও বুঝতে পারি নি!'

আমি হেসেই জিগ্যেস করলাম, 'আপনাদের অসুবিধেটা কী হলো?'

তরুণী দুজন পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। দুজনের মুখেই বিব্রত লজ্জার ছটা, কিন্তু বিবাহিতার মুখ একটু ম্লান, এবং একটু যেন শক্তও। বললেন, 'আমি বোধ হয় সিনেমাটা দেখতেই পারবো না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

বিবাহিতা চকিতে একবার অবিবাহিতার মুখের দিকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বললেন, 'আগে জানলে আমি কখনোই আপনার ট্যাক্সিতে উঠতাম না। আমি আপনার লেখার একজন কঠোর সমালোচক, আপনি আমার সব থেকে অপ্রিয় লেখক।'

অবিবাহিতা ডেকে উঠলেন, 'বৌদি!'

বিবাহিতা তরুণীকে রীতিমতো উত্তেজিত মনে হলো। উত্তেজনা আমার মধ্যেও কম ছিল না। এরকম নাটুকে সমালোচক আমি অনেক দেখেছি, তবু কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো। কিন্তু সমালোচনায় আমার সহনশীলতা অসীম, এটা প্রায় অহঙ্কার করেই বলতে পারি। আমি হেসে বললাম, 'এর জন্যে দুঃখ করবেন না। এটা ভুলে গিয়ে এখন আনন্দের সঙ্গে সিনেমা দেখুন।'

বলে আমি ট্যাক্সিতে উঠে চালককে যাবার নির্দেশ দিলাম। ট্যাক্সি এগিয়ে চললো।

ঘটনার দিন সাতেক পরে একটি পত্রিকা এলো ডাকে। পত্রিকাটি কয়েক মাসের পুরনো, একটি তাত্ত্বিক ইনটেলেকচুয়েল মাসিক পত্রিকা, লিটন ম্যাগাজিন বলা যায়। পুরনো পত্রিকা দেখে একটু অবাক হলাম, কিন্তু পাতা ওল্টাতেই রহস্য বুঝতে পারলাম।

আমাকে নিয়ে সুদীর্ঘ রচনা পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছে, আর প্রথম লাইন থেকে শেষ অবধি আমার লেখকসত্তাকে অজস্র ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। সমালোচক একজন মহিলা। আমার একটিই মাত্র সান্ত্বনা, সমালোচক মহিলা আমার প্রতিটি লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করেছেন, কিন্তু ত্রুটি ছাড়া কিছু পান নি।

লেখাটি পড়লাম এবং রেখে দিলাম। এসব আমার কাছে নতুন কিছু না। কারোর চোখে আমার সব কিছুই যদি ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়, আমি কী করতে পারি! এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, তবে ত্রুটিগুলো যথাযথ মনে রাখা এক দিক থেকে ভালো। এই পর্যন্তই, তা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি নি। পত্রিকাটির কথা ভুলে যেতেও সময় লাগলো না।

ছ'মাস পরের ঘটনা।

একদিন সকাল দশটা নাগাদ, আমার কলকাতার বাসায় এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। যুবক ভদ্রলোক, সঙ্গে দুজন তরুণী মহিলা। পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর স্ত্রী আর ভগ্নীর সঙ্গে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তরুণী দুজন আর কেউ নন, সেই ট্যাক্সির সহযাত্রিনীদ্বয়।

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক পত্রিকা আর প্রকাশকের দরজায় ঘুরে আপনার ঠিকানা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমি মশায় নিরীহ অধ্যাপক মানুষ, আপনার জ্বালায় আমার গৃহের শান্তি নষ্ট হতে বসেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, কেন?'

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমিই বলো, তুমিও একজন অধ্যাপিকা।'

অধ্যাপিকা হলেও, মহিলাকে তরুণীই বলতে হবে। স্বামীর কথায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, 'আহা, বাজে বকছো কেন? গৃহের শান্তি আবার নষ্ট হলো কোথায়?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হয় নি? সেইজন্যে আমার বোনটিকেও নিয়ে এসেছি সাক্ষী হিসেবে!'

ওঁরা সকলেই হেসে উঠলেন। অধ্যাপক আবার আমাকে বললেন, 'আপনাকে নাকি উনি কী সব বলেছিলেন, ট্যাক্সিতে যেদিন লিফ্ট দিয়েছিলেন! তারপর থেকে আবার আপনার বই পড়া শুরু করেছেন। গত দু' সপ্তাহ ধরে আমাকে খালি বলছেন, আপনার কাছে নিয়ে আসবার জন্যে। উনি নাকি এখন খুবই অপরাধবোধে আক্রান্ত।'

আমি ব্যস্তভাবে হেসে বললাম, 'না না, এতে আবার অপরাধ বোধের কী আছে। আমি তো সে-সব ভুলেই গেছি।'

অধ্যাপিকা বললেন, 'সেটাই আপনার সুবিধে, কিন্তু আমি ভুলতে পারি নি। আপনি কি একটা পত্রিকা পেয়েছিলেন, যাতে আপনার ওপর একটি লেখা ছিল?'

তিনি পত্রিকাটির নাম বললেন। তৎক্ষণাৎ আমার তা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ পেয়েছি, পড়েছিও। কিন্তু তার জন্যে—।'

অধ্যাপিকা আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তার জন্যে আমি নতুন করে আপনার লেখা আবার পড়েছি। যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, এখন আর তা ঠিক মনে হচ্ছে না।'

অধ্যাপক অর্থাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী বলে উঠলেন, 'আরো পড়ো, দেখবে আস্তে আস্তে আরো কম খারাপ লাগছে।'

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম এবং আমি তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম।*

—শেষ—